A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

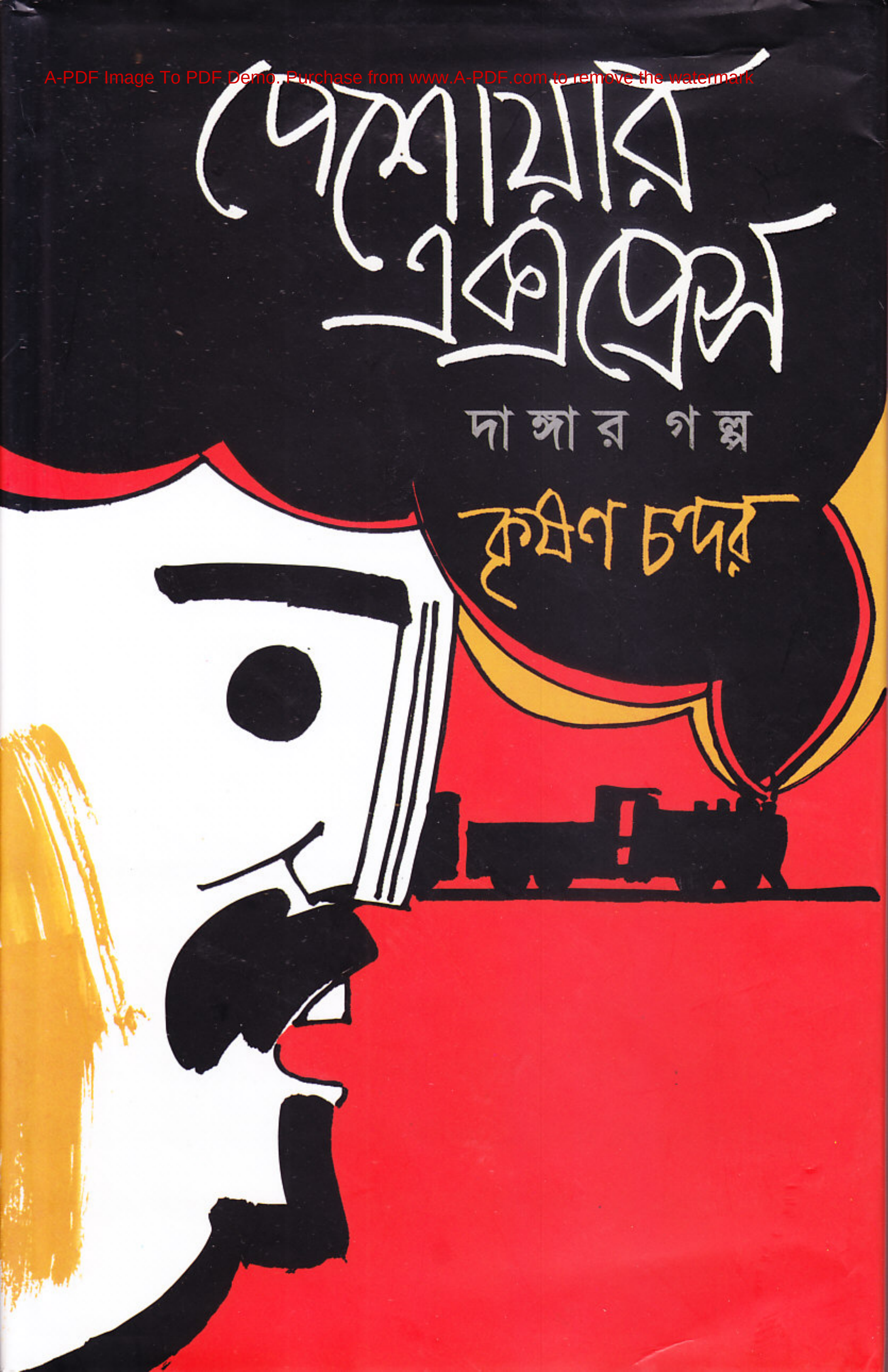

অনুবাদ : জাফর আলম

প্রথমা
প্রকাশন

পেশোয়ার এক্সপ্রেস
গ্রন্থস্বত্ব © অনুবাদক
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১৬, একুশে বইমেলা ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, জুন ২০১১
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : এক শ পঁচিশ টাকা

Peshawar Express
by Krishan Chandar, Translated by Zafar Alam
Published in Bangladesh by *Prothoma Prokashan*
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Price : Taka One Hundred Twenty Five Only

ISBN 978 984 8765 41 8

উৎসর্গ

বরেণ্য শিক্ষাবিদ আনিসুজ্জামান
এমেরিটাস অধ্যাপক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদকের কথা

কৃষণ চন্দর কথাশিল্পী হিসেবে জীবদ্দশাতেই প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। উর্দু গল্পকে তার সর্বোত্তম মর্যাদার আসনে আসীন করতে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনেও কৃষণ চন্দরের অগ্রণী ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ভারত বিভাগের সময় দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হয় ভারত ও পাকিস্তান। লাখ লাখ নারী-পুরুষ তাদের সাতপুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে এপার থেকে ওপারে এবং ওপার থেকে এপারে আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য হয়। প্রাণ হারায় লাখ লাখ অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশু। ধর্ষিত হয় অসংখ্য নারী। উদ্বাস্তু হয় পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও বাংলার লাখ লাখ মানুষ। এই বিভাজনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাঞ্জাবের অগণিত শিখ ও মুসলমান। ওই দুটি অঞ্চলের এক কোটির মতো মানুষ বাস্তুহারা হয়। সাতচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রগতিশীল লেখকদের বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। উভয় দেশের লেখকেরা দাঙ্গার বিরুদ্ধে কলম তুলে নিয়ে লিখেছেন সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী অসাধারণ সব কবিতা, গল্প ও উপন্যাস।

লেখনীর মাধ্যমে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আওয়াজ তুলেছিলেন, কৃষণ চন্দর ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে। তিনি লিখেছেন দাঙ্গাবিরোধী 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস'-এর পাশাপাশি একই বিষয়ভিত্তিক আরও কিছু অসাধারণ গল্প। এগুলোই পরবর্তীকালে *হ্যাম ওয়াহসি হ্যায় (আমরা বর্বর)* শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের মোট সাতটি গল্প উর্দু থেকে আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি। আমার শ্রদ্ধেয় মামা আব্দুল কাইয়ুমের কাছে এ ব্যাপারে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি *হ্যাম ওয়াহসি হ্যায়* উর্দু বইটি করাচি থেকে এনে দিয়েছিলেন। আমার লেখালেখির ব্যাপারে সর্বদা তিনি আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন।

বইটি লাখনৌ থেকে ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশ করেছিল 'কিতাবি দুনিয়া' প্রকাশনা সংস্থা। তারই ভূমিকা লিখেছিলেন প্রখ্যাত উর্দু কবি আলি সরদার জাফরি।

জাফরির এই ভূমিকার ভেতর দিয়ে কেবল কৃষণ চন্দরের এই সংকলনভুক্ত গল্পগুলো সম্পর্কেই কথা নেই, প্রশংসাবাক্য নেই, যে পটভূমিতে এই গল্পগুলোর জন্ম, সেই পটভূমিরও আছে বিশদ বিবরণ। সে বিচারে আলি সরদার জাফরির এই ভূমিকার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

কৃষণ চন্দরের গল্পের এই অনুবাদ সংকলনটি প্রকাশ করার ব্যাপারে প্রথমা প্রকাশনের প্রধান নির্বাহী অরুণ বসু ও নির্বাহী হুমায়ুন কবিরের আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে অভিভূত করেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে দিয়েছেন সুপ্রিয় আখতার হুসেন। তাঁদের উৎসাহ, সহমর্মিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার অনূদিত অন্যান্য গ্রন্থের মতো কৃষণ চন্দরের দাঙ্গার এই গল্পের সংকলন পাঠক মহলে আদৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মালঞ্চ, মিরপুর ৬
ঢাকা ১২১৬

জাফর আলম

সূচিপত্র

আলি সরদার জাফরির ভূমিকা	১১
উন্মাদ	১৭
লালবাগ	২৩
অমৃতসর : ভারত বিভাগের আগে	৩১
অমৃতসর : স্বাধীনতার পরে	৩৬
পণ্ডিত নেহরু ও জিন্নাহর প্রতি পতিতার খোলা চিঠি	৪৭
পেশোয়ার এক্সপ্রেস	৫৪
জ্যাকসন	৬৪
কিংবদন্তির উর্দু কথাশিল্পী কৃষণ চন্দর	৭৭

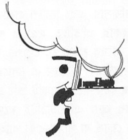

আলি সরদার জাফরির ভূমিকা

ভারত ও পাকিস্তানে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই আগুনের লেলিহান শিখায় মানুষ, বাড়িঘর আর পাঠাগারের পাশাপাশি আমাদের জীবন, স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং কৃষ্টি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কয়েক মাসের ব্যবধানে এর তীব্রতা কিছুটা কমলেও এখনো সম্পূর্ণ কমেনি। ছাইয়ের নিচে আগুন এখনো চাপা পড়ে আছে, যা একটু ফুঁ দিলেই আবার জ্বলে উঠতে পারে। এই ছাইয়ে বাতাস দেওয়ার লোকেরও অভাব নেই।

কিন্তু আগুন নেভানোর মানুষও রয়েছে অনেক। ভারত ও পাকিস্তানের মুক্তচিন্তার মানুষ ও প্রগতিশীল লোকজন এই গৃহযুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সফলকাম হবেনই। কারণ, সময়, ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ তাঁদের পক্ষে। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁদের শক্তি জোগাচ্ছে। বিপ্লবী শক্তি তাদের সহায় হচ্ছে। তাদের সমর্থনে রয়েছে মানবিকতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য।

কিন্তু গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কার্যকর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এর প্রকৃত কারণ যে এর অগ্নিসংযোগকারীদের হাতে, সেটা এখনো চিহ্নিত হয়নি। আজকের গৃহযুদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষের লড়াই নয়। বরং বিপ্লব ও স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে বিপ্লবের শত্রুসেনারা এই হামলা চালায়। ফলে হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়ে ঘৃণার সৃষ্টি হয় আর আঘাতে বিদীর্ণ হয়। এই সন্ত্রাসীরা অত্যন্ত সুসংগঠিত ও সশস্ত্র। অনেক চিন্তাভাবনার পর তাদের সূচিত গৃহযুদ্ধের মূল কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই হামলার লক্ষ্য ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা ছিল না। সংখ্যালঘুদের নাম দিয়ে এমন-কিছু করাটা ছিল একটা বাহানা বা অজুহাত মাত্র। আসলে এই হামলা ছিল পাকিস্তান ও ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের ওপর। বিগত পঞ্চাশ বছরের আত্মত্যাগের পরও সত্যিকারের স্বাধীনতা এখন পর্যন্ত অর্জিত হয়নি। সেই পুরোনো শক্তি বিপ্লবী আন্দোলনের গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, আর সেসব দলই এখনো বহন করে চলেছে স্বাধীনতার পতাকা।

এই সব প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লবের শত্রুকে হামলা চালানোর ব্যাপারে সুসংগঠিত করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ব্রিটিশ সামরিক অফিসার এবং ব্রিটিশ প্রশাসন। কারণ, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে দুটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও প্রশাসনের চাবিকাঠি ছিল তাদের হাতেই। আজ তাদের ষড়যন্ত্রের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে পড়েছে। ১৯৪৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর *পাকিস্তান টাইমস*-এ (লাহোর) চিঠিপত্রের পাতায় জ্যাকসন নামের একজন ইংরেজ অফিসারের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়ার জন্য এই চিঠিটিই যথেষ্ট। পরবর্তী ঘটনাবলিও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বর্ডার ফোর্স বা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অপকর্মের কথা কারও অজানা নয়। ইংরেজ সামরিক অফিসারদের নির্দেশে তাদের সহযোগিতাতেই পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের ওপর এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু শিখদের ওপর গুলি চালানো হয়। পাঞ্জাবের প্রশাসন দাঙ্গাকারী গুন্ডাদের সহায়তা করে। দিল্লিতে ইংরেজরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে পর্যন্ত তোয়াক্কা করেনি এবং মুসলিম সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হয়নি। দিল্লির দাঙ্গার ষড়যন্ত্রে এবং পাকিস্তানের দাঙ্গায় ওইসব ইংরেজ অফিসারই জড়িত ছিলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে সূর্য দু শ বছর পর্যন্ত মানবতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং একে আগুনে ঝলসে দিয়েছে, এখন তা অস্তমিত। তাদের সিংহাসন উল্টে গেছে। ইংরেজরা এশিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস, নতুন ভারতে তাদের দিন শেষ। তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য নতুন কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা জানত, ভারতে সামরিক শক্তি দিয়ে প্রশাসন চালাতে পারা যাবে না। তাই তারা বিপুল জনসমর্থনধন্য স্বাধীনতাসংগ্রামের পর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার বৈরিতা ও দুর্বলতার জায়গাগুলো থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। আমাদের জাতীয় পুঁজিবাদী শক্তির ভাবনা থেকেই এর উদ্ভব। তারা বলেছে, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী এবং জনগণের স্বার্থ যেকোনো মূল্যে রক্ষা করব।' এর ফলে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী অক্ষত থাকে। তাদের জন্মদাতা হলো ফিরিঙ্গি শাসক। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে তারা সেনাবাহিনীকেও ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে এবং তাদের দেশীয় দালালদের শেকল মুক্ত করে বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেওয়া হয়। ইংরেজদের এসব তাঁবেদার কুকুরের গলার বেল্ট খুলে দেওয়া হয়। মুসলিম, হিন্দু ও শিখদের উস্কানি দেওয়ার জন্য ইংরেজ শাসকেরা এক পায়ে খাড়া ছিল। এসব গুন্ডাকে ট্রেনিং দেওয়া ও অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য এগিয়ে আসেন দেশীয় রাজ্যের শাসকেরা। উল্লেখ্য, পাঞ্জাবের গৃহযুদ্ধে যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তা সরবরাহ করা হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য থেকে। এর সঙ্গে জড়িত ছিল পাতিয়ালা, ফরিদকোর্টের শিখ রাজ্য এবং বাহওয়ালপুরের মুসলিম দেশীয় রাজ্য। এই সব অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে সামরিক

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের (GHQ) অস্ত্রও ছিল, যা ইংরেজরা দেশীয় শাসক শাসিত রাজ্যগুলোতে বিতরণ করেছিল।

উগ্রপন্থী লোকজনের সংগঠন আকালিদের 'শহিদি দল', হিন্দুদের 'রাষ্ট্রীয় সেবা সংঘ' এবং মুসলমানদের 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই সব উগ্রপন্থী ভারতে হিন্দু সরকার আর পাকিস্তানে মুসলিম সরকারের পক্ষে স্লোগান দিয়ে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার নৌকাকে মানুষের রক্তের নদীর স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে চক্কর দেওয়াতে থাকে।

আজ পূর্ব পাঞ্জাবে একজন মুসলমানও নেই, পশ্চিম পাঞ্জাবে কোনো শিখ বা হিন্দুকে দেখা যায় না। হাজার বছরের পুরোনো গ্রাম লুট করা হয়েছে, হাজারো হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নারী রাস্তায় ও বাজারে প্রকাশ্যে ধর্ষিত হয়েছে। লাখো নিরীহ মানুষ মারা গেছে। এক কোটির মতো মানুষ বাড়িঘর থেকে বাস্তুহারা হয়েছে। খেত বিরান হয়েছে, কারখানা বন্ধ হয় গেছে। পোড়ানো হয়েছে বইয়ের দোকান। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে মূল্যবান দলিলপত্র। ছাত্রশূন্য মক্তব-মাদ্রাসায় পেঁচা উড়ছে। বাতাসে লাশের বিশ্রী গন্ধ। এসবের সৎকার করার কেউ নেই। নদীর পানিতে ভাসছে লাশ। তার পানি পর্যন্ত দুর্গন্ধময় হয়ে পড়েছে। ইংরেজরা শান্তিপূর্ণভাবে শাসনভার হস্তান্তর করেছিল, অথচ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হলো দেশের মাটি। শান্ত ভারতে শুরু হলো গৃহযুদ্ধ। দেহের কোথাও ফোড়া হলে তা অস্ত্রোপচার না করলে সারা দেহ বিষাক্ত হতে বাধ্য।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ফিরিঙ্গি প্রশাসক, দেশি দালাল, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ উগ্রপন্থীদের অভিযুক্ত করে আমরা প্রগতিবাদীরা নিজেদের বিবেক আর সংস্কৃতিসিক্ত হৃদয়কে কি সান্ত্বনা দিতে পারব? আমরা কি আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি? আমাদের কাজকর্মেরও পর্যালোচনা করা দরকার। আমাদের বাড়িতেই রয়েছে উগ্রপন্থী লোকজনের অস্তিত্ব। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, প্রগতিবাদীদের মধ্যে এখনো কিছু দুর্বলতা রয়েছে এবং এর দায়দায়িত্ব আমাদের ওপরেই বর্তায়। আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের জাতীয় নেতারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন। এই গৃহযুদ্ধ ফিরিঙ্গি রাজনীতির সাফল্যের দলিল। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নতুন মোর্চা শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। এর বিরুদ্ধে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে জোরদার প্রতিরোধ।

আরেকটি বড় প্রশ্ন, ঘৃণার যে বিষ আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছি, তাকে কীভাবে দূর করা যায়! ভারতের হিন্দু আর শিখেরা এবং পাকিস্তানের মুসলমানেরা যে বর্বর ও পশুসুলভ আচরণ করেছে, সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়লে শরীর শিউরে ওঠে। মনে হয়, এই দেশে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়নি। এশিয়ার মানুষের কানে আরব দেশের রসুলের বাণী পৌঁছায়নি। যেন অজন্তার গুহাচিত্র কখনো আঁকা হয়নি, ইলোরার মূর্তি কখনো গড়া হয়নি। তাজমহল কখনো নির্মিত

হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ইকবাল কখনো ভালোবাসার গান রচনা করেননি। এখন দেশ জুড়ে বয়ে চলেছে ঘৃণার ঢেউ। যেসব লোক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চায় না, তারাও পরিস্থিতির শিকার। অনেক জাতীয়তাবাদীকে বলতে শোনা যায়, হিন্দুস্তান থেকে সব মুসলমানকে বের করে দাও। পাকিস্তানি একজন সাহিত্যিক আমাকে চিঠি লিখেছেন, শিখ নাম শুনলেই তাঁর শরীরের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়, ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি-প্রান্তরে ঘৃণার রক্ত ঝরে পড়ছে। মানুষের শতাব্দী-প্রাচীন খোলস সাপের খোলস পাল্টানোর মতো খসে পড়ছে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে যেসব পশু পাহাড়ের গুহায় আর গাছের নিচে বসবাস করত, তারা আজ সভ্য সমাজের জনপদে খুনে দাঁত বের করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি বেদনাদায়ক বটে। তবে সবচেয়ে বড় দুঃখ হলো, আমাদের বেইজ্জতি হওয়ার ব্যাপারটা। বিশ্বের মানুষের চোখে আমাদের আত্মসম্মান থাকল না। মানলাম, হত্যা ও দাঙ্গার জন্য গুন্ডা এবং উগ্রপন্থীরা দায়ী। কিন্তু মানুষ হিসেবে যেসব শিশু পাকিস্তান অথবা ভারতে নিহত হয়েছে, তাদের দায়দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায়। আমরাও হত্যাকারীদের অপকর্মের অংশীদার। মৃত শিশুর সংখ্যা লাখ না হলেও কয়েক হাজার তো হবেই। তারা আমাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত অংশ নিচ্ছে। আমি ভাবি, যখন তারা ঘুমায় তখন তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? ঘুমন্ত অবস্থায় তারা কী স্বপ্ন দেখে? যখন তারা তাদের স্ত্রীদের আদর করবে, তখন তাদের কানে কি নিহতদের কারও চিৎকারের আওয়াজ আসবে না অথবা নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে যখন খেলা করবে, তখন তাদের কী ধরনের গল্প শোনাবে? লেখক বলবন্ত গার্গী এমন একজন হত্যাকারীকে দেখেছেন, যে ঘুমন্ত অবস্থায় প্রথমে বলে, 'মারো মারো।' আবার নিজেই চিৎকার করে ওঠে, 'আমাকে মারবে না, আমাকে বাঁচাও।' তার মানবিক সত্তা বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তার বিবেক ফরিয়াদ করছে, সে অন্য মানুষদের হত্যা করার পাশাপাশি নিজের মনুষ্যত্বকেও হত্যা করেছে, যে মনুষ্যত্ব ছিল তার বুকের গভীরে। এই ধরনের মানুষ আমাদের সামাজিক ও মজলিশি জীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে?

আমি ভাবি, দেশে আবারও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, বিরান খেতে আবারও ফসল ফলবে। আমরা নিজেদের বাহুবলে কলকারখানা আবারও চালু করব। কিন্তু এসব ঘাতকের বিবেক কীভাবে পবিত্র হবে, যারা নিজেদের বোনদের ধর্ষণ করেছে, উলঙ্গ নারীদের মিছিল বের করে 'আল্লাহু আকবর', 'সাত শ্রী আকাল' আর 'হর হর মহাদেব' বলে স্লোগান দিয়েছে! এরা মায়েদের দুধ ভারাবনত স্তন কেটে ছিন্ন করেছে। শিশুদের লাশ বর্শার ফলায় গেঁথে শূন্যে ঝুলিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। আমরা সেই সব খেতে উৎপন্ন ফল ও তরিতরকারি কীভাবে খাব, যার মাটিতে হাজারো নিরপরাধ মানুষের লাশ চাপা পড়েছে, যাদের হাড় পরিণত

হয়েছে সারে? কেউ কি বলতে পারে, যেসব শিশু রক্তাক্ত লাশের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেঁচে আছে, তারা বড় হয়ে কী রকম হবে? ওই সব মেয়ের ভালোবাসা কেমন হবে, যাদের মনে পুরুষের ভীতি জীবন্ত, স্বাধীনতার নামে যাদের সতীত্ব হরণ করা হয়েছে, তাদেরই-বা কী হবে 'যাদের পেটে ঘৃণার বীজ জীবনের ফুলে কলি হয়ে ফুটে আছে? আর ওই সব লোকের কী অবস্থা হবে, যারা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পরও প্রাণে বেঁচে গেছে আর এখন যাদের শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম লোমকূপে রক্তের দাগ?

আমাদের স্বাধীনতার সময়ে সংঘটিত অপরাধে যারা অপরাধী, তাদের বিরুদ্ধে কেবল শুদ্ধি অভিযান চালালে চলবে না, বিজয়ের পর ভেঙে যাওয়া মসজিদের মেহরাব মেরামত করে ক্ষান্ত হলে চলবে না, বরং এত দিনের গোলামির ফলে সৃষ্ট কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করতে হবে, আমাদের দেহে, হৃদয়ে ও মনে ঘৃণা, প্রতিশোধ আর সন্ত্রাসের মূর্তিতে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পাহাড়ের গুহায় বসবাসকারী পশু এখনো মানুষে পরিণত হয়নি। আমাদের নিজেদের মানবতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের পবিত্রতার জন্যও সংগ্রাম চালানো জরুরি। কথিত আছে, প্রাচীনকালে দেবতা ও রাক্ষসের মধ্যে লড়াই হয়েছিল। তখন তারা সাগর মন্থন করে। প্রথমে সাগর থেকে অমৃত, পরে বিষ নির্গত হয়। শিব পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য নিজে সেই বিষ পান করেন। আজ ভারত সত্যি সত্যিই মন্থন করা সমুদ্রের মতো, যেখান থেকে শুধু অমৃত নির্গত হয়নি, ঘৃণা ও গৃহযুদ্ধের বিষও নির্গত হয়েছে। এই বিষ পান করার জন্য একজন শিব যথেষ্ট নন বরং কোটি কোটি শিবের প্রয়োজন। একা গান্ধীজি এই বিষ পান করে হজম করতে পারেননি বরং আমাদের সবাইকে মিলে, প্রতিটি শিশু, নারী আর পুরুষকে মিলে এই বিষ পান করতে হবে। না-হলে আমরা পুড়ে ভস্ম হয়ে যাব।

লেখক হিসেবে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, উর্দু সাহিত্যিক-লেখকেরা জেগে উঠেছেন এবং তাঁরা এই পাশবিক পরিস্থিতি আর হৃদয়ের বিরক্তিকর অবস্থা তাঁরা অনুভব করেছে। বোম্বাইয়ের সাহিত্যিক, লেখক ও শিল্পীরা শান্তি মিছিল বের করেছেন। পাকিস্তানি লেখকেরা সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগেরই মুখ যেন বোবা, কলম বন্ধ। আমি যতটুকু জেনেছি, উপেন্দ্রনাথ আশক, ইসমত চুগতাই, খাজা আহম্মদ আব্বাস, কাইফি আজমি, ইউসুফ জাফর, ফিক্র তৌনসবি ও কৃষণ চন্দর ছাড়া কোনো লেখক এখন পর্যন্ত দাঙ্গা নিয়ে কিছুই লেখেননি। এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে, সেগুলোকে বেশ ভালো বলতে হবে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, যেন তা বড় ঢোলের বাজনার মধ্যে টিয়াপাখির আওয়াজের মতো কিছু। গুন্ডাদের ছুরি সিনেমার চেয়ে দ্রুত চলছে, তাদের বন্দুকের গুলির শব্দ কবিদের আওয়াজের চেয়ে তীব্র। মানুষের রক্ত এখন লেখকদের বইকে ভাসিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে! আমাদের অনেক বই লিখতে হবে, যেসব বই স্তূপ করে আমরা বাঁধ দিতে পারি, স্তম্ভ বা দেয়াল বানাতে পারি। যারা এই লেখনীকে দাঙ্গার সাহিত্য বলে দূরে ঠেলে দিতে চান, তাদের হৃদয় পচে গেছে এবং কবিতা ও শিল্পের ঝরনা শুকিয়ে গেছে।

আজ চল্লিশ কোটি ভারতীয় ও পাকিস্তানি প্রতিটি লেখক এবং কবির নাম ধরে হাঁক দিচ্ছি, তোমরা আমাদের সুপ্ত আবেগকে ভাষা দান করেছ। এসো, আমাদের হৃদয়ের নতুন ক্ষতকে দেখো, চারদিকে চোখ মেলে তাকাও, তোমাদের সামনে অসংখ্য ভীতসন্ত্রস্ত চোখ নজরে পড়বে। শোনো, আমাদের তালা দেওয়া ঠোঁটের ওপর কী শব্দ বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে! আমাদের বুকে কী ধরনের স্লোগান চাপা পড়ে আছে, যা বের হওয়ার জন্য অস্থির। তোমরা ওই সব গান গাইতে পারতে, যা আমরা গাইতে চাই কিন্তু গাইতে পারোনি। তোমরা রক্তাক্ত মানুষের কাহিনি শোনাতে পারতে; কিন্তু পারোনি। তোমরা সেই সব অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করতে পারতে, যা পূরণ হওয়ার আগেই ভেঙে গেছে।

আজ ভারত ও পাকিস্তানে আওয়াজ উঠছে, চল্লিশ কোটি মানুষ আওয়াজ তুলছে। তাদের পাশাপাশি লেখক কবিরাও নীরব নেই, তারাও আওয়াজ তুলছেন। তাদের মধ্যে কৃষণ চন্দরের আওয়াজ সবার ঊর্ধ্বে, তাঁর আওয়াজ বুলন্দ আওয়াজ। কিন্তু সেই আওয়াজ এখন স্তিমিত কিন্তু এর মধ্যেও ধীরে ধীরে আকাশে বিদ্যুতের চমকানি এবং মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব ভারতের অট্টহাসির প্রতীক্ষায় আছে।

আলি সরদার জাফরি
উর্দু কবি

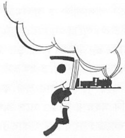

উন্মাদ

চকমতির পাশের গলিতে পির জাহাজি এলাকায় ছিল মাত্র দুটি হিন্দুবাড়ি। একটি তিনতলা। সবচেয়ে উঁচু। তাতে থাকত লালা বাঁশিরাম ক্ষত্রিয়। সে পাঞ্জাবি ক্ষত্রিয় ছিল না। ছিল যুক্ত প্রদেশের ক্ষত্রিয়দের বংশধর। সব সময় হিন্দুস্তানি ভাষায় কথা বলত। তাই পাঞ্জাবিরা তাকে অপছন্দ করত। শুধু ভাষা নয়, তার চালচলন ছিল ক্ষত্রিয়দের মতো। তার বাড়ির মেয়েরা নাচ ও গানের বেশ অনুরাগী। বাড়িতে সব সময় বাজত রেডিও। তার সবচেয়ে ছোট মেয়ে পুষ্পা। বয়স ষোলো কি সতেরো। দিনমান বাড়ির তিনতলা ছাদের ওপরে উঠে আমাকে উসকানি দেওয়ার জন্য নাচানাচি করত। আমি আমাদের আর সে তাদের বাড়ির ছাদ থেকে একে অন্যের কাছে প্রেম নিবেদন করতাম। কিন্তু আমি মুসলমান আর সে হিন্দু ক্ষত্রিয়, চামার, তাও আবার যুক্ত প্রদেশের। তবুও শুধু পুষ্পা নয়, বাড়ির অন্য মেয়েদেরও গলিতে একা দেখা যেত না। তারা মোটরে চেপে দল বেঁধে বাঁশিবাগে বেড়াতে যেত। আর এদিকে আমাদের বাড়ির মেয়েদের সওদা করতে বাজারে যেতে হতো। পর্দা করা মুশকিল ছিল। ফলে ভদ্র মুসলমান মহল্লার লোকজন ক্ষত্রিয় লালা বাঁশিরামের বাড়ির লোকজনের ওপর চটা ছিল। এ ছাড়া লোকগুলোও সুবিধের ছিল না। মুসলমানদের ভালো চোখে দেখত না। আসলে এমন কোনো বিধর্মী কি আছে, যাদের কাছে মুসলমানরা ধোঁকা খায়নি। এরা তাদেরই বংশধর। বিধর্মীদের মনমানসিকতা মুসলমানদের মতো নয়। মুসলমানরা স্পষ্টবাদী। মনের কথা সবার সামনে খোলাখুলি বলে থাকে। কিন্তু বিধর্মীদের মুখের কথা মিষ্টি হলেও ভেতরে হাজার রকমের প্যাঁচ! বিধর্মীদের ওপর যারাই ভরসা করেছে, তারাই মরেছে।

দ্বিতীয় বাড়িটা ছিল ব্রাহ্মণ রাম নারায়ণের। তার মা ছিলেন ঝগড়াটে স্বভাবের মহিলা। মহল্লার সব মেয়ে মানুষ একদিকে আর তিনি একাই একদিকে। বিশ্রী ভাষায় গালাগালাজে তার জুড়ি ছিল না। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেউ

পারত না। এমন বিশ্রী ভাষায় কথা বলতেন যে, মানুষের বুক জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যেত। আমাদের এখানে চামারনিরা পর্যন্ত সাবধানে গালাগালি ও গালমন্দ করে থাকে। কিন্তু রাম নারায়ণের মায়ের কাছে তারা নাচার। পুরো মহল্লার সবাই এই বুড়িকে অপছন্দ করত। রাম নারায়ণ কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র ব্রাহ্মণ। গাড়ির মতো দৃঢ়পায়ে তাঁর হাঁটাচলা। আর মানুষ হিসেবেও আত্মভোলা। দিনরাত ধর্মকর্ম নিয়ে মগ্ন। সবার সঙ্গে কথা বলতেন হাসিমুখে। আমি তার মুখে গালির শব্দ কখনো শুনিনি। কাউকে কড়া কথা বলতে দেখিনি। দেখিনি মহল্লায় কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতেও। এ ধরনের লোক আসলে কোনো কাজের নয়। অর্থাৎ কারও সঙ্গে সে ঝগড়া করবে না। এ অবস্থায় তার সঙ্গে কে ঝগড়া করতে আসবে? ঝগড়া করতে চাইলেও ঝগড়া করার উপায় নেই। রাম নারায়ণ সব সময় ভেজা বেড়ালের মতো মাথা নিচু করে ঘর থেকে বের হন আবার একইভাবে ঘরে ঢোকেন। কেউ ডাকলে ত্বরিত দুই হাত জোড় করে প্রণাম জানান। খুবই ভীতু ব্রাহ্মণ তিনি।

রাম নারায়ণের চার-চারটি ছেলে। তিনজনই স্কুলে পড়ে। চার নম্বর ছেলের বয়স এক বছর। রাম নারায়ণের বউকে বেশির ভাগ সময় দরজার কাছে তার শিশু সন্তানটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। হিন্দু মেয়েদের লজ্জা-শরমের বালাই নেই। তারা পর্দা করে না। সবার সামনে বুক খুলে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় আর বাচ্চারাও কেমন চুকচুক করে মায়ের বুকের দুধ খেয়ে থাকে।

যখন দাঙ্গা শুরু হয়, প্রথম দিকে এখানে তখন শান্তি কমিটি করা হয়েছিল। কমিটিতে রাম নারায়ণ এবং লালা বাঁশিরাম ক্ষত্রিয় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমরা এসব ঝামেলার মধ্যে ছিলাম না। মুসলমানদের তরফ থেকে আমরা মসজিদের ইমাম এবং কাঠ ব্যবসায়ী মালিক ফতেহ্ মুহাম্মদকে বৈঠকে পাঠিয়ে দিই। আসলে ওই কমিটি-টমিটির ব্যাপারে আমরা মন দিতে পারিনি। মারপিট, হাঙ্গামা আর গন্ডগোল না হলে কোনো মজা নেই। শান্তি কমিটি করা হচ্ছে স্রেফ লোক দেখানোর জন্য। এদের মনের ভেতরটা কূটনীতিতে ভরা। আমরা ভাবলাম, ওরা শান্তি কমিটি করলে কী হবে, ওসব চলবে-টলবে না। লালা বাঁশিরাম ক্ষত্রিয়কে বেশ চিন্তিত মনে হলো। এ ব্যাপারে তাকে দৌড়ঝাঁপও করতে দেখা যায়। চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, সে যদি ভালোভাবে বসবাস করে, তাহলে কোনো মুসলমান তার গায়ে হাত ওঠাবে না। আর যদি সে চালাকি করে কোনো ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়, তাহলে তার জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আছে। লালা বাঁশিরাম সবার সামনে হাতজোড় করে বলল, আমি ৫০ বছর ধরে আপনাদের প্রতিবেশী। আমার দাদা লালা শ্রীকন রাম অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এ কথা শুনে বৃদ্ধ পিরান বক্স বললেন, ওর কথায় কান দিয়ো না। ওর দাদা শ্রীকন রাম নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মামুলি একটা ব্যাপারে তিনি

আমার ছেলেকে ছয় মাসের জেল দিয়েছিলেন। অলংকারের একটা দোকান থেকে সে দশটা টাকা ছিনতাই করেছিল।

বুড়ো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু উপস্থিত সবাই তাকে থামিয়ে দেয়।

লালা বাঁশিরাম ভীত হয়ে পড়ে কিন্তু নীরব থাকাই তার জন্য মঙ্গলকর মনে হয়। কারণ উল্টোপাল্টা কথা বললে মুসলমান ছেলেদের হাতে তার মার খাওয়ার আশঙ্কা ছিল। যা হোক, শান্তি কমিটি কিছুদিন চালু থাকার পর তার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম দিকে কেউ মুখ খোলেনি। কিন্তু বিহারে মুসলমানদের ওপর যখন বিপদ ঘনিয়ে আসে তখন আমাদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। এই শালাদের ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে। এই তো সেদিনকার কথা, সারা ভারতের ওপর আমরাই রাজত্ব করেছি। আর ডাল খাওয়া কাফেররা তখন আমাদের জুতোর নিচে বসে থাকতে আনন্দ পেত। আর আজ তাদের এত সাহস বেড়ে গেছে! তাই আমি, রশিদ, ফজু মুচি আর গল্লে কুস্তিগির এবং গলির আর আট-দশজন যুবক মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে, এখানকার হিন্দুদের বিহারের ঘটনার স্বাদ পাওয়া উচিত। মসজিদের ইমাম সাহেব এ ব্যাপারে আমাদের গালমন্দ করলেন। কিন্তু আমরা টুঁ শব্দটি করলাম না। অবশ্য আমাদের পরিকল্পনামতো সবার অজান্তে আমরা তৈরি হতে থাকি। কয়েক দিনের মধ্যে আমরা আমাদের বাড়ির মেয়েছেলে আর বাচ্চাকাচ্চাদের ভাটি গেটে পাঠিয়ে দিই। কারণ চকমুতি পির জাহাজি গলি ছিল অগুনতি মুসলমানের মহল্লা। তবে শাহ আলমি গেট এখান থেকে বেশ কাছে। শাহ আলমিতে হিন্দুদের দাপট বেশি। যেকোনো সময় হামলা হতে পারে। তাই আমরা বাড়ির মেয়েছেলে ও বাচ্চাদের ভাটি গেটে পাঠিয়ে দিয়ে চিন্তামুক্ত হওয়াটাকেই সংগত বলে মনে করি। আর এর কিছুদিন পরই শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। হিন্দুরাই শুরু করে। লাহোরের কৃষ্ণগলি, রামগলি, কৃষ্ণনগর, সন্তনগর এবং শাহ আলমি গেটের মতো এসব এলাকায় হিন্দুদের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। ওসব জায়গায় মাঝেমধ্যেই দু-একজন করে মুসলমান খুন হতে থাকে। আমরা আর কত দিন চুপ করে বসে থাকব! মুসলমানরা গরিব, বোকা এবং আক্রান্ত হতে পারে; কিন্তু ভীতু নয়। একবার আল্লাহর নাম নিয়ে লাহোরের মুসলমানরা যদি জেগে ওঠে, তখন দিন দুয়েকের মধ্যেই হিন্দু ও শিখদের নাভিশ্বাস উঠে যাবে। আকবরি দরজা থেকে ভাটি গেট এবং শাহ আলমি গেট থেকে শাহি মহল্লা পর্যন্ত সব জায়গায় 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি শোনা যেতে থাকে। সমস্ত বেনে, লালা, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণগোত্রের লোকজন ভয়ে মেয়েদের আঁচলে মুখ লুকোয়।

পির জাহাজি গলির মুসলমান যুবকেরাও চুপ করে বসে নেই। প্রথমেই আমরা লালা বাঁশিরাম ক্ষত্রিয়ের বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করি, কিন্তু অসভ্য হিন্দুটি গেটে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কিছুদিন আগে লোহার দরজা

লাগিয়েছে, বাড়ির পেছন দিকে আবার হিন্দু মহল্লা। ওখানেও লোহার দরজা। দু-তিনবার আমরা দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি করার পর চুপ হয়ে যাই। শেষে বিরক্ত হয়ে আমরা বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিই। তার বাড়িতে অনেক মূল্যবান আসবাব, গহনা এবং গমের ভান্ডার ছিল বলে জানতাম। এসবের কিছুই আমরা পাইনি। বাড়িটায় আগুন লাগানোর পর এমনভাবে জ্বলছিল, শুকনো কাঠ উনুনে ঠেসে দেওয়ার পর যেভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, ঠিক সেইভাবে। আগুনের স্ফুলিঙ্গ অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। লালা বাঁশিরাম নিজেকে এবং বাড়ির লোকজনকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু বেচারা ব্যর্থ হয়। অনেক আবেদন-নিবেদন করেছে। কিন্তু আমরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। পুষ্পার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছিল। ওকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার ছিল না। ও বাড়ির ভেতরে আগুনে জ্বলেপুড়ে মারা যায়। অথচ আমি কিছুই করতে পারলাম না। কীই-বা করার ছিল! এ রকম অবস্থায় মুসলমান হয়ে হিন্দুর প্রতি দয়া দেখাতে গেলে লোকজন আমাকে অভিযুক্ত করত। এ কথা ভেবেই আমি নীরব থাকি। জানি না, মৃত্যুর সময় পুষ্পার কী অবস্থা হয়েছিল! তিনতলা বাড়ির ছাদের দিকে ওকে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য ছুটতে দেখেছি। লালা বাঁশিরামের বউয়ের শরীরের কাপড়চোপড়ে আগুন লেগে গিয়েছিল। সে আত্মরক্ষার জন্য তিনতলা থেকে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছু জ্বলন্ত আগুন থেকে কেউ কি নিজেকে রক্ষা করতে পারে?

লালা বাঁশিরামের বাড়ি যখন পুড়ছিল, তখন একজন দেখল, আরেকটি হিন্দুর বাড়ি তখনো অক্ষত। সেটা ছিল রাম নারায়ণ ব্রাহ্মণের বাড়ি। আমরা সবাই তার বাড়ির দিকে এগিয়ে যাই। বাড়িটা ছিল মামুলি গোছের। গেট ও দরজার ছিটকিনি ভেতর থেকে লাগানো ছিল। দরজার কড়া নাড়ার পরও কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তখন রশিদ ভাই এবং গল্লে কুস্তিগির নিজের কাঁধের ধাক্কায় গেটের পাল্লা ভেঙে ফেলে। সামনে রাম নারায়ণ ব্রাহ্মণ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেচারা ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলেন। রশিদ জিগ্যেস করল, 'দরজা খোলোনি কেন?'

তিনি উত্তর দেন, 'জি জি, আমি শুয়ে ছিলাম।'

তার উত্তর শুনে আমার হাসি পায়। আমি নিজেকে সামলে নিই। গল্লে কুস্তিগির বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছ? চলো, বাইরে চলো।'

'বাইরে গিয়ে কী করব,' রাম নারায়ণ জিগ্যেস করলেন।

'বাইরে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী উত্তর দিচ্ছ,' রশিদ আবার বলল।

এবার গল্লে কুস্তিগির তার ঘাড়ে হাত রেখে এমনভাবে ধাক্কা দিল যে, তিনি চৌকাঠের বাইরে গিয়ে পড়ে গেলেন। আর ভজে এগিয়ে গিয়ে তার পেটে ছুরি বসিয়ে দিল। আর রাম নারায়ণ দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে থাকেন। তার মা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসেন। ভজে তার পেটেও ছুরি বসিয়ে

দেয়। তিনি ছেলে রাম নারায়ণের ওপরে পড়ে যান। তারপর নারায়ণের স্ত্রীর পালা। চার ছেলের মা। দেখতে কুশ্রী। তাকে মুসলমান হিসেবে ধর্মান্তরিত করার জন্যও কেউ রাজি হতো বলে মনে হয় না। এক বছরের ছোট ছেলেটা বিছানার ওপরে শুয়ে ছিল। তার চোখেমুখে এসব ঘটনার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সে আসলে ঘুমিয়ে ছিল। রশিদ ছুরি বের করে তাকে মারতে যেতেই আমি তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিই। রশিদ প্রশ্ন করে, 'কী হলো সাপের বাচ্চা!'

আমি বললাম, 'বাদ দাও। বড় হলে ওকে আমরা খুন করব।'

'না, না,' ভজে নরম গলায় বলল।

আমি কড়া ভাষায় বললাম, 'না, ওকে ছেড়ে দাও।' আসলে আমার ছোট ছেলে ইয়াকুবের কথা মনে পড়ে যায়। ওরও বয়স এখন এক বছর। বাচ্চাটাকে ছেড়ে আমরা মালামাল দেখতে শুরু করি। দেড়-দুই হাজার টাকার অলংকার, নগদ আট শ টাকা পেয়েছি। নিজেদের মধ্যে সেগুলো আমরা ভাগাভাগি করে নিই। কাপড়ের সিন্দুকে বাচ্চাদের জামাকাপড়। ওরা তখনও স্কুল থেকে ফিরে আসেনি। রাম নারায়ণের বিয়ের কাপড়চোপড় সিন্দুকে সযত্নে রাখা ছিল। বিয়ের সময় পাওয়া তার বউয়ের কাপড়চোপড়ও ছিল। এসবও আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিই। আমার ভাগে পড়েছে ছয়টা রেশমি শাড়ি, আর একটা সুতির কাপড়। গহনার মধ্যে আমার বউয়ের পরার জন্য এক জোড়া কানের দুল, কপালের ঝুমুর আর একটা রুপার গ্লাস। লুটের মাল বাধাছাঁদা করে নিয়ে আমরা 'নারায়ে তকবির' স্লোগান দিয়ে উঠি। বাইরে বাগানে, রক্তে লাল ড্রেনের পাশে পড়ে ছিল রাম নারায়ণ, তার মা ও বউয়ের লাশ। লালা বাঁশিরাম ক্ষত্রিয়ের লোহার দরজার গেটের সামনে পড়ে ছিল তার বউয়ের লাশ। সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তিনতলা থেকে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আশপাশের বাড়িঘরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সব দোকানপাট বন্ধ। অলিগলি আর বাজারে কোথাও কোনো লোকজন নেই। জনমানবশূন্য। এদিকে-সেদিকে মুসলিম লিগের ঝান্ডা উড়ছে।

আমরা নানা গলিঘুজি দিয়ে বিভক্ত হয়ে নিজের নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিই। গল্লে কুস্তিগির মস্তি গেটের দিকে চলে যায়। ভজা আকবরি বাজারের উদ্দেশে রওনা দেয়। আমি ও রশিদ ভাই দাতা দরবারের পেছনে চাচা নুর ইলাহির বাড়ির দিকে এগোতে থাকি। ওখানে এখন অনেক মুসলমানের ভিড়। তারা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিচ্ছে। জানা গেল, দর্শননগরে হিন্দু মহাসভার সমর্থক একটি দল দাতা দরবারে পেছন দিক দিয়ে ঢুকে মুসলিম এলাকায় হামলা চালিয়েছে এবং বাড়িঘরেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে যেতে থাকি। পথে চাচা নুরের সঙ্গে দেখা। তিনি আহাজারি করতে করতে বলতে লাগলেন, 'সব ধ্বংস হয়ে গেছে বাবা, সব ধ্বংস হয়ে গেছে।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিগ্যেস করি, 'কী হয়েছে চাচা?'

'হিন্দুরা আমাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তোমার চাচি আগুনে পুড়ে মারা গেছে,' নুর চাচা কপাল চাপড়াতে থাকেন।

'আর আমার বউয়ের কী খবর,' আমি ভীতি মেশানো গলায় জানতে চাই।

'কাফেররা ওকে খুন করেছে।'

বাড়ি পুড়ে ছাই। তখনো আগুন পুরোপুরি নেভেনি। দরজার কাছে আমার বউয়ের লাশ পড়ে ছিল। হামলাকারীরা ওর মাথাটা পুরোপুরি থেঁতলে দিয়েছে। আমার বড় ছেলে সাত বছরের দাউদ আমার বউয়ের পাশেই নিথর পড়ে আছে। ওর ঘাড়ের ওপরের আঘাতটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। আমি বাচ্চাদের জন্য কাপড় এনেছি। বউয়ের জন্য মাথার ঝুমুর আর বেনারসি শাড়ি!

হায় আল্লাহ, এ কেমন সর্বনাশ! আমি নুর চাচাকে জিগ্যেস করি, আমার অবোধ ছোট ছেলে দুধের শিশু ইয়াকুব সুস্থ আছে কি না!

নুর চাচা বলল, 'কাফেররা প্রথমে ওকে ছেড়ে দিয়েছিল; কিন্তু হামলাকারী একজন বলল, এ তো সাপের বাচ্চা। তারপর তারা ওর গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই দেখো, তোমার ইয়াকুবের হাড়-মস্তক জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'চাচা, তোমরা সবাই কি মরে গিয়েছিলে? মহল্লায় কি কোনো পুরুষ ছিল না? আমরা সবাই লুটপাটের জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কে জানত, এই অসভ্য হামলাকারীরা আমাদের অবর্তমানে নিরস্ত্র মেয়েদের ওপর হামলা চালাবে? আমি শাড়ি, গয়না এবং রুপোর গ্লাস ইত্যাদি আমার বউয়ের সামনে এনে রাখলাম। তার লাশ ছুঁয়ে শপথ নিয়ে বললাম, 'আয়েশা, তোমার নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমার খুনের বদলা যদি না নিই, তা হলে আমি আমার পিতার সন্তান নই, একটা শুয়োরের বাচ্চা।' এ কথা বলে ছুরি হাতে নিয়ে আমি গলির বাইরে চলে যাই। রশিদ আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল।

চাচা নুর চিৎকার করে ওঠেন, 'কোথায় যাচ্ছ, পুলিশ আসছে!'

'পুলিশের মা-বোনের গুষ্টি কিলাই।'

আমি তখন সরাসরি শাহ আলমি এলাকার দিকে যাচ্ছি। কার হিম্মত আছে আমাকে বাধা দেয়?

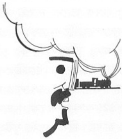

লালবাগ

কমলাকরের চোয়াল খুবই শক্ত। এত মজবুত যে, মুখের হাড় আর চোয়ালের মাঝখানের মাংস যেন গর্তে পড়ে গেছে। তার গায়ের রং ফরসা। মাঝারি গড়ন। শরীর বেশ মজবুত। চোখেমুখে বিদ্যুতের মতো চমক আর দুষ্টুমি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু তাকে দেখলে ত্রিশের নিচে মনে হয়। কমলাকর ছিল লালবাগের সুপরিচিত দাদা। ছোটকালে পকেট মারার কৌশল শিখেছিল। দু-চারবার জেল খেটে সে বোম্বের সবচেয়ে নামকরা ও সম্মানিত পকেটমার বনে গেছে। একে তো বোম্বে একটা বাণিজ্যিক শহর, পাশাপাশি শিল্পকেন্দ্রও। এখানে মিল, কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের গুদাম—সবকিছু আছে। কিন্তু লোহা, কার্টন, তেল, কাগজ আর খাদ্যদ্রব্যের কালোবাজারি হওয়া সত্ত্বেও শিল্প-বাণিজ্যের রমারমা দশা। এখানে অপরাধ জগতের লোকের আড্ডা, তাদের হাত দিয়ে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। মালাবার হিল থেকে শুরু করে মদনপুরার বস্তির ঝুপড়ি পর্যন্ত সব জায়গাতেই অপরাধ-জগতের মানুষ লেনদেনের জন্য তৈরি থাকে। কমলাকর অপরাধ জগতের তেমনি সুপরিচিত একজন। লালবাগে তার দাদাগিরি চলে। কাজটা কিন্তু সহজ নয়। ভারত-পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হওয়া সহজ কিন্তু লালবাগের দাদা হওয়া অনেক কঠিন। কমলাকর পঞ্চাশ বছরের পরিশ্রমের পর এই মর্যাদা আদায় করে নিতে পেরেছে। একেবারে ছোট থাকতেই সে বাবা-মায়ের হাত ধরে কারদার থেকে বোম্বে এসেছিল। তার বাবা-মা এখানকার ভিক্টোরিয়া মিলে চাকরি করতেন। আর কমলাকর সারা দিন গলিতে তার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করে কাটাত। ট্রাম গাড়িতে বিনা টিকিটে চড়ে বেড়ানো, ফলের দোকানদারদের সঙ্গে ঝগড়া করা, জুতো পালিশওয়ালাদের ধমকানো, ভদ্রলোক পথচারীদের কাছে ভিক্ষা করা, পান-বিড়িওয়ালা দোকানদারের কাছ থেকে বিড়ি নিয়ে ধুঁয়ো ফোকাই ছিল তার কাজ।

একজন গরিবের ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে এ-রকমের আজেবাজে কাজকর্মের ভেতর দিয়েই। এরপর একজন দয়ালু লোক তাকে পকেট মারার কলাকৌশল শিখিয়ে দেয়। পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে তিন-চারবার তাকে জেলেও যেতে হয়েছে। প্রথমে চরিত্র সংশোধনের জন্য তাকে কিশোর চরিত্র সংশোধনী স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে যাওয়ার পর মনে পড়ে গিয়েছিল তার গ্রামের কথা। মনে পড়ে গিয়েছিল ছোট ছোট মুরগির বাচ্চার কথা, যেগুলোর সঙ্গে সে বাড়ির উঠোনে খেলা করত। নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা কাশবনের ঝোপ-জঙ্গলে একবার সে একটা পাখির বাসা দেখতে পেয়েছিল। বাসাটা ছিল একটা ফুটফুটে তিতির পাখির। তাতে দেখতে পেয়েছিল বেশ কয়েকটা কোমল ডিম। হাতের তালুতে ডিমগুলো নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করেছিল। চেষ্টা করেছিল ডিমগুলোর উষ্ণতা অনুভব করার। তারপর সেগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে ছুটতে শুরু করেছিল আর একটা তিতির পাখির পেছনে। তিতিরটার ছোটাছুটি দেখে একটা খরগোশ কান খাড়া করে সজাগ হওয়ার পরপরই সেও প্রাণপণে পালাতে শুরু করেছিল। আর তা-ই দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সে কী হাসি! তিতিরের ফুটফুটে রং পরিবেশকে রঙিন করে তুলেছিল আর তার হাসি হাওয়ায় সৃষ্টি করেছিল গুঞ্জরণের। হঠাৎ খরগোশটা কিছুটা তফাতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল আর হতবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। হয়তো ভেবেছিল, ছেলেটি কেন হাসছে! সেই প্রথমবারের মতো কমলাকরের মনে পড়েছিল এসব স্মৃতি।

দ্বিতীয় দফা তাকে কিশোর সংশোধন স্কুল নয়, নেওয়া হয়েছিল জেলে। সেবার তার মনে পড়েছিল বোম্বের অলি-গলির কথা। বোম্বের এসব গলিতে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে উনুনে তৈরি গরম নিমকি আর সঙ্গে চা খেতে খুব মজা লাগে। তারপর বাঘ মার্কা বিড়ির ধোঁয়া ফোকা। লালবাগের পাশে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ক্লাবের ফুটবল ম্যাচের কথাও মনে পড়েছিল। এই ফুটবল ম্যাচের প্রতি ছিল তার দারুণ আকর্ষণ। জীবনেও সে ফুটবল খেলেনি। তবে সে ফুটবল ছুঁতে চায়। গোলাকার বলের লাফালাফি আর তাকে শূন্যে উড়তে দেখে তার ভারি মজা লাগে! কমলাকরের ইচ্ছা হতো, ফুটবলে এমন লাথি সে মারবে, যাতে শূন্যে থাকা ফুটবলটা কয়েক মাইল দূরে গিয়ে পড়ে, আর লোকজন হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কিন্তু এ রকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। তার কাজ ছিল ফুটবল-দর্শকদের পকেট কাটা। পকেট মারার জন্য তিনটা মোক্ষম জায়গা ছিল। প্রথম জায়গাটা ছিল ফুটবল মাঠ। সেখানে দর্শকরা খেলা দেখতে গিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকে যে, তাদের সব রকমের চিন্তা-চেতনা লোপ পেয়ে যায়। আর দ্বিতীয়টা ছিল রাজনৈতিক জনসভা অনুষ্ঠানের জায়গা। জনসভায় বক্তারা এমন অনলবর্ষী ভাষণ দেন যে, সমবেত হিন্দুর মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর মুসলমানদের মনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আর ভারতীয়দের মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন জ্বলে ওঠে।

কমলাকরও রাজনৈতিক জনসভায় যোগ দিয়ে থাকে। তার কাছে বক্তাদের মিষ্টি ভাষা পছন্দ নয়। কারণ ওই সময়টায় জনতা পকেট সাবধানে রাখে। ঘৃণা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা জনতা আগ্রহের সঙ্গে শোনে। জনসভায় গিয়ে প্রথমে সে জেনে নিত, কে কে বক্তা? সে জানে, যখন চরকার গুণাবলি ব্যাখ্যা করে ভগোমল হাগবানি বক্তৃতা করবেন, তখন পকেট কাটা মুশকিল। কিন্তু বক্তারা যখন বোম্বাইকে মহারাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির ধমক দিতেন আর বোম্বাই থেকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনকে তাড়ানোর হুমকি দিতেন, কমলাকর সেদিন নিশ্চিতভাবেই দু-চারটে পকেট মারতে পারবে বলে বুঝতে পারত। তাই সে সবকিছু জেনেবুঝে রাজনৈতিক জনসভায় যোগ দিত। অবশ্য রেলওয়ে প্লাটফর্মেও নিয়মিত যেত, দৈনিক অন্তত দু-তিনবার। বিশেষত সন্ধ্যার দিকে, যখন লোকজন তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত, অস্থিরতা আর ভীতি তাদের মনে কাজ করত, ভিড়ের মধ্যে ওই সময়টায় কমলাকরের পকেট মারতে গিয়ে সুবিধা হতো। তবে এখন সে এই পেশার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছে।

কারণ এরই মধ্যে সে দু-দুবার জেল খেটেছে। তৃতীয়বার জেলে যাওয়ার পর নিজে বেশ চালাক-চতুর হওয়ার সুযোগ পেল। জেলে ঢোকার পর তার মনে হলো, সে কোনো স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সে অন্য সব পেশার অপরাধীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে বুঝতে পারল, অপরাধ-জগতে এখনো সে শিশুমাত্র। বোম্বাইয়ে এমন অনেক বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে দৈনিক লাখ লাখ টাকার লেনদেন হয়। পকেট মারা কি কোনো ধান্দা হলো! লোকজন মেয়ে নিয়ে বেচাকেনা করে, আহমেদাবাদ থেকে চরস, আফিম, ভাং আমদানি করে, মদের দোকান খোলে, গোপনে কোকেন তৈরি করে। তারপর সেগুলো কালোবাজারে বিক্রি করে। জুয়ার আড্ডায় ধনী লোকদের পকেট খালি করার অভিনব সব কৌশল আছে। ফলে তৃতীয় দফা জেলে যাওয়ার পর সে পকেট মারার পেশা ছাড়ার অঙ্গীকার করে। এরপর সে আফিম, চরস আনা-নেওয়ার ধান্ধা করতে গিয়ে বেশ লাভবান হয়। পুলিশ ও অন্য সহযোগীরা তার কাছ থেকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকাকড়ি পেতে থাকে। অচিরেই সে লালবাগের দু-চারজন বড় বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করে। এরপর সে কোনো দিন জেলে যায়নি। দু-একবার অবশ্য পুলিশ তাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেঠজিরা তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন।

এখন তার বয়স পঞ্চাশ। তার জুয়োর নিজস্ব আখড়া আছে। আছে শুড়িখানা আফিমের কারবার। আছে একটি পতিতালয়, নিজস্ব বাড়ি-গাড়ি, বউ আর চার ছেলেমেয়ে। গ্রামের বাড়িতে পাকা দালান করেছে। গ্রামে অনেক জমিজিরেত করেছে। লোকজন এখন তাকে ইজ্জত করে। যেদিক দিয়েই সে যায়, লোকজন তাকে দেখলে সম্মান জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাকে দেখে মাথা নিচু করে পাশ

কাটিয়ে চলে যায়। আজ সে যখন দুপুরের আহার শেষে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন লোক। বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে সে চার নম্বর বউয়ের গালে টোকা দেয়। তার হাতে এসিডের একটা বোতল। সেটা নিয়েই বের হচ্ছিল। দরজায় ছোট ছেলে রাত্ত দাঁড়িয়ে ছিল। সে তাকে বলল, 'মদের দোকানের দিকে যাবে না, সেখানে রণজিৎ ফিল্ম কোম্পানির স্টুডিও। ওই এলাকার মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করবে না। তোমাকে অনেকবার বলেছি, এখন তুমি সেদিকে যাবে না।' রাত্ত কান ধরে বলল, 'আর কখনো সেদিকে যাব না দাদা।' ছোটকাল থেকেই রাত্ত বাবাকে 'দাদা' বলে ডাকে। তাকে বোঝানোর পর কমলাকর এসিডের বোতল হাতে এগিয়ে যায়। বোতল সে তার পছন্দের কর্মচারী শংকরের হাতে তুলে দেয়। তারপর লালবাগের বড় বাজারে গিয়ে হাজির হয়।

এখানে কাল রাতেও গন্ডগোল ছিল। বোম্বাইয়ে এক বছর যাবৎ হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা চলছে। কিন্তু গতকাল রাতে দারুণ হাঙ্গামা হয়েছে। কমলাকর দাঙ্গা লাগলে খুশি হয়। কারণ, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় তার অবৈধ ব্যবসা তেমন জমে না। পুলিশও সতর্ক থাকে। কিন্তু দাঙ্গা বাধলে পুলিশের বিশেষ কোনো দিকে খেয়াল থাকে না। কালকের রেশন কোথা থেকে আসবে, চরস-আফিম কে পাকড়াও করবে, এসব কাজ নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে বেশি। ফলে দাঙ্গার এই পরিবেশে দাদা কমলাকরের ধান্দা ভালোই চলছিল। শেঠরা আগে থেকে অনেক দয়ালু হয়ে পড়েছেন। তার দেখাশোনার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করছেন আর বিস্তর হিন্দু যুবককে পুষছেন মাসোহারা দিয়ে। অন্যদিকে রাতে তারা ভদ্র ছেলের মতো মিল-কারখানায় মজদুরিও করে। ভোরবেলা বাড়িতেও ফেরে। এখন তাদের মনে শান্তি আছে, ভালো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আছে, পকেটে থাকে ভালো ব্রান্ডের সিগারেট। রাতে মদ আর মেয়ে মানুষের সঙ্গ। হিটলারের ছেলে আসছে জানলে যেমনটা ঘটে, মানুষের মনে তেমনই ভীতি ছিল, এই দাঙ্গা সারা জীবন চললে মন্দ কি। কমলাকরের কানের কাছে মুখ নিয়ে শংকর বলল, 'রাতে চার জন মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে।' কমলাকর তার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে বলল, 'শাবাশ।' তারপর জানতে চায়, 'ওরা কারা?'

'এখনো ওদের লাশ ওঠানো হয়নি। চলুন, আপনাকে দেখাই।'

ভিক্টোরিয়া মিলের ওদিকে সরু গলিতে করপোরেশনের ঝাড়ুদাররা যেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখে, সেখানেই পড়ে আছে একজন যুবকের লাশ। অর্ধনগ্ন, পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। হাতে তেলের শিশি। সম্ভবত তাকে মা তরকারি রান্না করার প্রয়োজনে তেল আনতে দোকানে পাঠিয়েছিল।'

'কীভাবে চিনলে?'

শংকর ইশারায় দেখাল, 'খতনা করা আছে। তাতে চেনা যায়।'

'শাবাশ,' কমলাকর বলল। 'তেলের শিশিটা নিয়ে নাও, কোনো গরিব হিন্দুর কাজে আসবে।' তারপর কমলাকর জিগ্যেস করল, 'দ্বিতীয় ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে?'

'সেটা আমার এলাকায়। ঘিঞ্জি গলির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কারদার স্টুডিও পেরিয়ে যেতে হবে। যেখান থেকে একটা জনশূন্য সড়ক ডকইয়ার্ডের দিকে গেছে, সেখানেই রাস্তার পাশের একটা গর্তে একজন বৃদ্ধের লাশ পড়ে আছে। মনে হয়, বেঁচে থাকার জন্য পয়দা হয়নি। লোকটার ঠোঁটে, মাথায়, চোখে, পায়ের পাতায়, সারা শরীরের প্রতি কোনাকানচিতে দারিদ্র্যের ছাপ। জন্মের পর থেকে তার জীবনসংগ্রাম প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। তার জীবন যেন পুরোনো বইয়ের ছেঁড়া পাতা। তার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে ক্ষুধা, বেকারত্ব, রোগ, আর দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ ছবি। বৃদ্ধ সে কাদা-মাটিতে পড়ে আছে তাও একটি গর্তের। জীবন তার গর্তে শুরু আর গর্তেই শেষ। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এই কাদামাটিতে চলাফেরা করেছে। তার মুখে কোনো দিন দুবেলা আহার জোটেনি। তার কান কোনো দিন ইকবালের রচনা করা গান শোনেনি। তার চোখ জোড়া কখনো সুন্দর কোনো দৃশ্য দেখেনি। তার এই ধারাবাহিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াকে কি জীবন নামে আখ্যায়িত করা যায়?'

এখন এই লাশ কমলাকরের প্রতীক্ষায় আছে। আরে, এটা তো শিধোর লাশ! শিধো বেরিলির বাসিন্দা। ত্রিশ বছর ধরে সে বাদাম বিক্রি করত। অনেক পুরোনো লোক। ট্রামচালক থেকে শুরু করে দোকানদার, দলিল লেখক, গুজরাটি শেঠের কর্মচারী আর সুদখোর পাঠান—সবাই তাকে চেনে। সে তেমনই পুরোনো মানুষ, যতটা পুরোনো বোম্বাইয়ের বাসস্ট্যান্ড আর ভিক্টোরিয়া মিলের ঘড়ি অথবা ইরানি রেস্তোরাঁ। এগুলো বাদ দিলে লালবাগ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উনুনে ভাজা বাদাম ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে গাহকদের কাছে বিক্রি করত খোশ মেজাজে আলাপ করতে করতে। এভাবে বাদাম বিক্রির ব্যাপারটা সে বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিল। তার সারাটা জীবন হিন্দুদের সঙ্গেই কেটেছে। তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন আর বৃদ্ধকাল কেটেছে তাদের সঙ্গে একই ছাদের নিচে। এই মহল্লাতেই তার বিয়ে হয়েছে। গুজরাটি শেঠরা তাকে বিয়ে উপলক্ষে পাঁচ শ রুপি সাহায্য করেছে। তার বউ আর ছেলেপিলেরা নির্ভয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করত। সে লালবাগের সৃষ্টি এবং এই পরিবেশেরই অংশবিশেষ। তাদের আনন্দ, বেদনার অংশীদার সে। এদের ছেড়ে সে কোথায় যাবে?

দাঙ্গা শুরু হলে অনেক মুসলমান তাকে লালবাগ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু শিধো তাদের কথায় কান না দিয়ে বলেছে, আমি হিন্দুদের মধ্যে থাকি। আমাকে কেউ কিছু বলবে না। দুই দিন আগে কমলাকরও তা-ই বলেছিল। বলেছিল, 'শিধো মিয়া, যেসব মুসলমান দেশকে দুই টুকরো করেছে, আমরা

তাদের বিরুদ্ধে। তুমি তো আমাদের লোক। তোমার লোম কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।'

কমলাকর সামনে এগিয়ে গিয়ে শংকরকে বলল, 'আরে, তাকে কেন মারতে গেলে?'

শংকর জবাব দিল, 'কী করব, আমার এলাকায় একমাত্র সে-ই বেঁচে ছিল। আর আমার প্রয়োজন ছিল পঞ্চাশ রুপির।'

কমলাকর পঞ্চাশটা রুপি বের করে তার হাতে তুলে দেয়। শেঠজি আগামী সপ্তাহ থেকে পঞ্চাশকে পঁচিশে নামিয়ে আনবে। কারণ, শেঠজির মতে, 'মুসলমানদের হত্যা করার জন্য দক্ষ লোক পাওয়া যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'শেঠজি, লালবাগে বাইরের লোক আসতে পারবে না। আর আমার ভাড়াটে লোকেরা তো একজন মুসলমানকে হত্যা করার জন্য পঞ্চাশ রুপি নেবে।'

পঞ্চাশ রুপি মাত্র। শিধোর বাড়ি, শিধোর বউ, শিধোর ছেলেপিলে, মাত্র পঞ্চাশ রুপি তাদের মূল্য! ভাজা বাদামের কড়া স্বাদ। বাদাম নাও...। পঞ্চাশ রুপি। একটি ছোট্ট টিমটিমে প্রজ্বলিত প্রদীপ। চার আনায় সকাল সন্ধ্যার আহার। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, শিশুদের নিষ্পাপ চেহারা। স্ত্রীর কমনীয় মিষ্টি হাসি, পঞ্চাশ রুপি। রাতে গরম লেপের নিচে বিছানায় নীরবে শুয়ে থাকা। বাচ্চাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপা শব্দ, শিধোর দাড়িতে মোলায়েম হাত বোলানো, খেলতে খেলতে শিশুদের বাবার কোলে ঘুমিয়ে পড়া—মাত্র পঞ্চাশ রুপি।

কমলাকরের চিন্তা অন্যদিকে। কল্পনার রাজ্যে হঠাৎ করেই সে যেন খেই হারিয়ে ফেলে। তারপর এগিয়ে যেতে থাকে। ধূর্ত সিং বলল, হাসপাতালের পিছে মজদুরদের ঝুপড়ি। সেদিকে সরকারি হাসপাতালের পেছনেই খোলা মাঠ। ওখানেই তালগাছের বাগান। অনেক দিন থেকেই একজন মাড়োয়ারি সওদাগর বাগান জমিসমেত বিক্রি করতে চাচ্ছিল। কিন্তু জমির দাম দিন দিন বাড়ছিল। জায়গাটা কীভাবে বিক্রি করবে—এ ব্যাপারে খুবই চিন্তায় ছিল সে। সে গজপ্রতি দুই রুপি হিসেবে জমিটি কিনেছিল। এখন অনেকে গজপ্রতি দশ রুপি দিয়ে কিনতে চায়। সে কাউকে বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি দিলে আবার অন্য একজন গজপ্রতি এগারো রুপি দাম হাঁকছে। তৃতীয় দিন গজপ্রতি বারো রুপি দাম হাঁকল অন্য একজন গাহক। তাই সে দারুণ বিপদে আছে। গত ছয় বছর ধরে মাড়োয়ারি এই ব্যবসায়ী তার জমি বিক্রি করতে চাইলেও পারছে না। কারণ, একের পর এক গাহক জমির দাম ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে।

এরই মধ্যে বেলুচি ভবঘুরের দল সেখানে এসে বসতি স্থাপন করে। কাশ্মীরি মুসলমানের দলও এসে হাজির। তারা কাঠের গুদামে কাজ করত। অন্যদিকে ডকইয়ার্ড রোডে সুদখোর পাঠানরা তাদের ময়লা নেহরু কোটের পকেটে বুকের

সঙ্গে এক শ রুপির নোটের বান্ডিল ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য : মজুর, কেরানি ও সিনেমার বেকার লেখকদের কাছে সুদে টাকা ধার দেওয়া আর এক শ রুপির বদলে এক শ রুপির সুদ আদায় করা। তারাও ওই মাঠে তাঁবু ফেলেছে। তাঁবুর ওপর দিয়েছে তালপাতার ছাউনি। যেন বৃষ্টি না পড়ে। দাঙ্গার সময় এই বস্তি ক্রমেই খালি হয়ে যায়। আর এখন দিন কয়েকের মধ্যেই সেই মাঠ তাঁবুর পর তাঁবুতে একাকার হয়ে গেছে। কমলাকরকে ধূর্ত সিং বলল, 'সেখানে তো কেউ ছিল না। দুজন কাশ্মীরি মুসলমান এসেছিল। তারা স্বামী-স্ত্রী। ছেলেরা আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। আত্মীয়ের বাড়ি খুঁজছিল। আমি ওদের দুজনকে ওই যে ওখানে একপাশে নিয়ে গিয়ে খতম করে ফেলেছি। চলুন, তালগাছের বাগানের দিকে...। দুজনই ছিল যুবক-যুবতী। পরনে ময়লা জামাকাপড়। চোখে-মুখে ভীতির ছাপ। তাদের মুখে এমন আত্মভোলা ভাব, তারা বুঝতেই পারেনি যে তাদের হত্যা করা হবে। তাদের জীবন যেন বলছে, তারা এখানে মরতে আসেনি। তারা তো এসেছে কাশ্মীরের উল্লুর থেকে। তারা এসেছিল মধু, জাফরান আর সাদা বরফের দেশ থেকে। তাদের গ্রামে আজ আপেলের গাছে ফুল ধরেছে, মখমলের মতো সবুজ ঘাস আর ডালে ডালে ঝুলছে লাল গোলাপ ফুল। আর নাশপাতিগাছের সবুজ পাতাগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে। ঝিলাম নদীর স্বচ্ছ পানি নীল পাথরের বুক চিরে বয়ে চলেছে, যেন গুনগুনিয়ে গান করছে।

ওদের দেশ কাশ্মীর। ওদের জীবন ফিরিয়ে দাও। ওরা এখানে থাকবে না। মেয়েটির ঘাড়ের আঘাতে রগ কেটে গেছে। আর তার সেই মাথার ওপর যেন কাশ্মীরের সূর্যোদয় কাঁদছে। তার ঠোঁটে ভিনদেশের শিশির। নীল চোখজোড়া স্থির আর তার দুটো হাত স্বামীর হাতের মুঠোর মধ্যে। কাশ্মীরের শাহজাদা যেন শতাব্দীর ছেঁড়া কম্বলের ওপর শুয়ে আছে। নিজের দারিদ্র্য ও কপর্দকহীন অবস্থা সত্ত্বেও রক্তের তখতে বিচিত্র ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে। তার একটি হাত তার স্ত্রীর হাত ধরে আছে, অন্য হাতটি দেহের অন্য পাশে ঝুলছে। সেটা যেন আকাশকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ করছে। তার শরীরে অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন। কারণ সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে তার স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সেটা ছিল ব্যর্থ চেষ্টা। কাশ্মীর মরে গেছে। ধানের খেত শুকিয়ে গেছে। লজ্জায়, শরমে বরফ-মাটির বুকে মুখ লুকিয়েছে। আর তার শক্ত একটা হাত যেন বলছে, অত্যাচারীরা, তোমরা একজন মুসলমানকে হত্যা করোনি, তোমরা একজন মানুষকে হত্যা করেছ, হিন্দুস্তানকে হত্যা করেছ। তোমরা তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি আর শালিমারবাগকে হত্যা করেছ। এটা হলো অশোকের লাশ, এটা সম্রাট আকবরের প্রতি ব্যভিচার, এটা পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতার লাশ। তারা হলো বিশ্বাসঘাতক হিন্দু আর মুসলমান রাজনীতিক জায়গিরদার, যারা এখন

কথিত শান্তির ধারক ও বাহক। তারা ধূর্ত পুঁজিপতি। তারা খুন করা মানুষের রক্তের ওপর নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

কমলাকর হেসে বলল, 'বেশ আয়াশ করে কোনো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জানত না, এখানে দাদা কমলাকরের সঙ্গে মোলাকাত হবে।'

কমলাকর খিলখিল করে হাসতে থাকে। কিছুক্ষণ পর নিজের পকেট থেকে এক শ রুপির একটা নোট বের করে ধূর্ত সিংয়ের হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'লাশগুলোর সৎকারের যথাযথ ব্যবস্থা করো।'

কমলাকর সন্ধ্যায় দৈনিক *আখবারে হিন্দ* পড়ছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, আজ বোম্বাই শান্ত ছিল। আগরিপাড়া, গোলপিটা, ডোগরি, কালবাদেবী, ভেন্ডিবাজার—কোথাও কোনো অঘটন ঘটেনি। শুধু লালবাগে ছুরিকাঘাতের চারটি ঘটনা ঘটেছে। অন্য আর সব জায়গার পরিস্থিতি শান্ত ছিল। কমলাকর পত্রিকা ভাঁজ করে পানওয়ালার হাতে তুলে দেয়। তারপর বলে, 'বাঘ মার্কা একটা বিড়ি দাও তো। আর এই নাও তোমার কোকেন।'

অমৃতসর : ভারত বিভাগের আগে

জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজারো মানুষের ভিড়। এই জমায়েতে হিন্দু ছিল, শিখ আর মুসলমানও ছিল। হিন্দুরা মুসলমান থেকে আর মুসলমানরা শিখদের থেকে আলাদা। কারণ তাদের বেশভূষা পৃথক। সহজে চেনা যায়। তাদের চেহারা-সুরত, স্বভাব-চরিত্র আর সংস্কৃতি আলাদা। ধর্মও আলাদা। কিন্তু আজ তাদের সবাই জালিয়ানওয়ালাবাগে একই উদ্দেশ্য নিয়ে সমবেত হয়েছে। তাদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা পুরোপুরি এক আর অভিন্ন। এই অভিন্ন লক্ষ্যই বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকজনকে এখানে সমবেত করেছে। আশপাশের পরিবেশ উত্তেজনায় ভরা। মনে হয়, বাজারের প্রতিটি পাথর আর বাড়ির প্রতিটি ইট তাদের নীরব উত্তেজনা আর আবেগ সম্পর্কে অবহিত। তাদের হৃদয়ের কম্পন থেকে একটিই গান ধ্বনিত হচ্ছে বারবার, ভারতের আজাদি—স্বাধীনতা।

জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। সবাই স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত। তাদের হাতে কোনো লাঠি বা রিভলবার ছিল না। ছিল না ব্রেনগান অথবা স্টেনগান। হ্যান্ডগ্রেনেডও ছিল না। ছিল না দেশে-বিদেশে তৈরি বোমাও। তাদের কাছে কিছুই ছিল না সত্যি; কিন্তু তাদের প্রখর চোখের চাহনি থেকে যেন উত্তপ্ত লাভা নির্গত হচ্ছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আর অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী মানুষের হয়ে উঠেছে ইস্পাতকঠিন মন। তাদের হৃদয় স্বর্গীয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ, যা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে সম্মিলিত সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের ভেতর দিয়ে। পাঞ্জাবের পঞ্চনদের পানি, এর রোমাঞ্চ এবং খাঁটি দেশপ্রেমে মোড়া ঐতিহাসিক শৌর্যবীর্য আজ সমবেত প্রতিটি মানুষের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। একটা ভিন্ন ধরনের গর্ব তাদের বুকে। জাতি যখন যৌবনে পা দেয়, ঘুমন্ত দেশ তখন জেগে ওঠে, তখন এমনটাই হয়ে থাকে। যারা অমৃতসরের এই পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখেছে, তারা কখনো এই পবিত্র শহরের দৃশ্য ভুলতে পারবে না।

জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজারো মানুষের ভিড় আর হাজার গুলিও বর্ষিত হয়েছে জনতার ওপর। তিন দিক থেকে রাস্তা বন্ধ আর একদিকে খোলা ছিল একটিই মাত্র ছোট্ট দরজা। এই দরজা দিয়ে সবাই জীবন-মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। আনন্দচিত্তে হাজারো স্বাধীনতাকামী মানুষ শহীদ হয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য। হিন্দু, মুসলমান আর শিখ—সবাই মিলে বুক পেতে দিয়েছে। পঞ্চনদের সঙ্গে ষষ্ঠ আরেকটি নদী মিলেছে। সেই নদী তাদের সম্মিলিত রক্তস্রোতের। নদীর স্রোতের মতো ফুঁসে উঠে এই রক্তস্রোত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ঠেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। পাঞ্জাবের মানুষ গোটা দেশের জন্য রক্ত দিয়েছে। এই বিশাল আকাশের নিচে একটি মাত্র লক্ষ্য ও আবেগের জন্য বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকজনের জীবন উৎসর্গ করার ঘটনা বিরল। শহীদের রক্ত আবেগকে আরও শক্তিশালী করেছে। আন্দোলন নতুন রূপ পেয়েছে। লক্ষ্য একটাই—স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।

সিদ্দিক কাটরা ফতেহ খান এলাকার অধিবাসী। একই এলাকার বাসিন্দা ওম প্রকাশ। সে অমৃতসরের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ীর ছেলে। ছোটবেলা থেকেই সিদ্দিক আর ওম প্রকাশের মধ্যে জানাশোনা। অবশ্য দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল না। কারণ সিদ্দিকের বাবা চামড়া বিক্রি করত। গরিব। আর ওম প্রকাশের বাবা ছিল ধনী। কেবল দুজনের মধ্যে জানাশোনার সূত্রেই আজ তারা জালিয়ানওয়ালাবাগে এসে মিলেছে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দুজন নেতাদের ভাষণ মন দিয়ে শুনছে। ছোটবেলার বন্ধু তারা। মাঝেমধ্যে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। যেন একে অন্যের মনের গোপন কথা ধরে ফেলেছে। আর সেই কথাটা হলো—স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।

গুলি যখন ছোড়া হয়, তার একটি গিয়ে লাগে ওম প্রকাশের কাঁধে। সে মাটিতে পড়ে যায়। ওই অবস্থায় ঝুঁকে তাকে ধরতে যেতেই সিদ্দিকের পায়েও গুলি লাগে। তার পায়ের মাংস ভেদ করে সেটা বেরিয়ে যায়। একবার, দুবার, তিনবার বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ চলে। আর তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। শিখের রক্ত মুসলমানের আর মুসলমানের রক্ত হিন্দুর রক্তের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তাদের লক্ষ্য ছিল অবিচল আর মনোবল ছিল সুদৃঢ়। একই গুলি সবার বুক বিদীর্ণ করে চলে যায়। সিদ্দিক ওম প্রকাশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। নিজেকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। তারপর আহত ওম প্রকাশকে টেনেহিঁচড়ে একটা দেয়ালের কাছে নিয়ে যায়। দেয়ালটা তেমন উঁচু ছিল না। লাফিয়ে সেটা পার হওয়াও কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু এই দেয়াল পার হতে গিয়ে ব্রিটিশ সেপাইদের গুলির শিকার হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। সিদ্দিক দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে পড়ে। তখনো অবিরাম গুলি চলছে। সিদ্দিক বলল, 'ওম প্রকাশজি, আল্লার নাম নিয়ে দেয়াল টপকে ওপারে চলে যাও।'

গুলি চলছেই। শাঁ শাঁ শব্দ তুলে সেগুলো পাশের দেয়ালে এসে লাগে। সিদ্দিক অনুচ্চ স্বরে বলে, 'তাড়াতাড়ি করো।'

ওম প্রকাশ ততক্ষণে দেয়াল টপকে ওপারে চলে গেছে। সিদ্দিক দুই হাতে মাটি আঁকড়ে ধরে চারদিকে তাকায়। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে দেয়াল টপকে দেয়ালের ওপারে গিয়ে ধপাস করে পড়ে যায়। ঠিক এই সময় আরও একটি গুলি চোখের পলকে ছুটে এসে তার একটা পা ভেদ করে চলে যায়। সিদ্দিক তখন ওম প্রকাশের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ওম প্রকাশকে তুলতে গিয়ে বলে, 'তুমি বেশি আঘাত পাওনি তো?'

অবশ্য ওম প্রকাশ এরই মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল। গুলির আঘাতেই তার হাতের হীরার আংটিটি জ্বলজ্বল করছে। তার পকেটে দুই হাজার টাকার নোটের বান্ডিল। তার দেহের তপ্ত রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। দেহে খিঁচুনি হচ্ছে, নড়াচড়া করছে; কিন্তু ধড়ে প্রাণ নেই। সিদ্দিক তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে তার বাড়ির দিকে রওনা দেয়। ওদিকে সিদ্দিকের নিজের গুলিবিদ্ধ পা থেকে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। অনেকে তাকে বোঝাল, ওম প্রকাশের ধর্ম আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, সে বিধর্মী। কিন্তু সিদ্দিক কারও কথায় কান দেয়নি। নিজের রক্তাক্ত পায়ের কথাও ভুলে গেছে। সে ওম প্রকাশকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। সম্পূর্ণ অপরিচিত পথ। আসলে কাটরা ফতেহ খান এলাকার দিকেই সে যাচ্ছে। যাচ্ছে একজন কাফেরকে কাঁধে তুলে নিয়ে। তার মন অত্যন্ত আনন্দিত। কাটরা ফতেহ খান এলাকায় পৌঁছেই সে উপস্থিত সবাইকে বলে, 'এই নাও শহিদের লাশ, হীরার আংটি আর দুই হাজার টাকার নোট।' এ কথা বলার পর পরই সিদ্দিকও মাটিতে পড়ে যায়। এরপর এলাকাবাসী এক সঙ্গে জানাজা পড়ে দুজনের লাশ সহোদর ভাইয়ের মতো অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে দাফন করে।

তখনো কারফিউ শুরু হয়নি। রামদাস লেনের দুজন মুসলমান মহিলা, একজন হিন্দু আর একজন শিখ—তরকারি কিনতে এসেছে। তারা পবিত্র গুরুদুয়ারার সামনে দিয়ে এগিয়ে যায়। সবাই শিখদের পবিত্র জায়গা গুরুদুয়ারার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সবজি কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কারফিউ শুরু হবে। আকাশে-বাতাসে শহীদের রক্তের আর্তনাদ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি আর সবজি কেনাকাটা করতে গিয়ে দেরি হয়ে যায়। তারা যখন ফিরছিল, কারফিউ বলবৎ হতে তখন মাত্র মিনিট কয়েক বাকি। বেগম বলল, 'এসো, এই গলি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তাহলে ঠিক সময় মতো বাড়ি পৌঁছাতে পারব।'

পারুল বলল, 'ওখানে তো ব্রিটিশ সৈন্য আছে। তাদেরকে বিশ্বাস করা চলে না।'

জয়নব বলল, 'মেয়েদের ওরা কিছু বলবে না। আমরা ঘোমটা দিয়ে বেরিয়ে যাব। চলো, তাড়াতাড়ি চলো।'

ওরা চার জন দ্বিতীয় গলির পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। তাদের দেখে ব্রিটিশ সৈন্যরা বলল, 'এই পতাকাকে সালাম করো। এটা হলো ইউনিয়ন জ্যাক—ব্রিটেনের পতাকা।' মহিলারা ঘাবড়ে গেলেও পতাকাকে যথারীতি সালাম জানায়। আবার সৈন্যরা ইশারায় গলির শেষ সীমানা দেখিয়ে নির্দেশ দিল, 'হাঁটু গেড়ে মাটির সঙ্গে ঘষটে ঘষটে শিগ্‌গিরই এখান থেকে বেরিয়ে যাও। সরকারের নির্দেশ মাথা নিচু করে হাঁটো, আর মাটির সঙ্গে হাঁটু ঘষটে ঘষটে এগিয়ে যাও।'

শ্যাম কাউর বলল, 'আমরা সোজাসুজি হেঁটে যাব। দেখি, কে আমাদের বাধা দেয়!'

এ কথা বলেই সে এগিয়ে যেতে থাকে। পারুল ভীত হয়ে বলল, 'দাঁড়াও...দাঁড়াও।'

প্রহরী ব্রিটিশ সৈন্যরা বলল, 'থামো, না হলে গুলি চালাব।'

শ্যাম কাউর সোজা হেঁটে যাচ্ছিল। শাঁই শাঁই শব্দ, গুলির শব্দ। শ্যাম কাউর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জয়নব ও বেগম পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। তারপর দুজন হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাত ওপরে তোলে। কয়েক মিনিট পর কী হয় তারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলি পার হতে থাকে। গোরা সৈন্যরা তাদের সাহস দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। রাগে তাদের মুখগুলো লাল হয়ে ওঠে। আবার রাইফেল তাক করে গুলি চালায়। শাঁই শাঁই।

পারুল কাঁদছিল। সে ভাবল, এবার তার পালা, তাকে মরতে হবে। পতিদেবকে স্মরণ করে ভাবছিল, কী বিপদে পড়েছি! তার ছেলে, মা-বাবা আর স্বামীপ্রবরের কথা মনে পড়ে। তাদের জন্য মনে মনে দোয়া পড়ে প্রার্থনা করে। 'আজ আমাকে মরতে হবে, কিন্তু আমি মরতে চাই না। তবুও আমাকে বোনদের পথ অনুসরণ করতে হবে।' পারুল সিদ্ধান্ত নিল। পারুল কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে যেতে থাকে।

ব্যাপারটা দেখে পাহারায় থাকা গোরা সৈন্যটি ভদ্রভাবে বলল, 'কান্নাকাটির দরকার নেই। সরকারের হুকুম মেনে চলো। এই গলি দিয়ে মাটিতে হাঁটু ঘষটে ঘষটে এগিয়ে যাও। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।'

হাঁটু ভেঙে মাটি ঘষটে ঘষটে কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়, একজন সৈন্য তার নমুনা দেখাল। পারুল কাঁদতে কাঁদতে গোরা সৈন্যটির কাছে আসে। তারা কয়েকজন সটান দাঁড়িয়ে ছিল। পারুল তাদের একজনের মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়, তারপর ঘুরে গলির পথ ধরে বুক টান করে এগিয়ে যেতে থাকে। গোরা সৈন্যটি তো হতবাক। তারপর রাইফেল তাক করে গুলি চালায়। পারুল ছিল তার বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে ভিতু আর দুর্বল। সে তাদের সবার শেষে এগোতে গিয়ে

গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মারা যায়। জয়নব, বেগম আর শ্যাম কাউরের লাশও মাটিতে পড়ে ছিল।

ঘরের বউ, পর্দানশিন মহিলা, স্নেহময়ী মা, যাদের বুকগুলো স্বামীদের জন্য ভালোবাসা আর শিশুদের জন্য মায়া-মমতায় ছিল ভরা, তারা গোরা সৈন্যদের নির্যাতনের শিকার হলো। তাদের শরীর গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেলেও তাদের পাগুলো একটুও টলেনি। হয়তো, সে সময় কারও ভালোবাসার ডাক শুনতে পেয়েছিল তারা অথবা কারও আলিঙ্গনের আকর্ষণ ছিল তাদের সামনে। হয়তো কারও মুখের মুচকি হাসি তাদের এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মন বলেছে, না, আজ মাথা নত করব না। কয়েক শতাব্দী পর আজ এই সুযোগ এসেছে, সারা ভারত জেগে উঠেছে। ফলে তারা গলি দিয়ে সোজাসুজি হেঁটে গেছে, মাথা উঁচু করে এগিয়ে গেছে, জয়নব, বেগম, পারুল আর শ্যাম কাউর। একজন বলেছে, দেশে কি সীতারা মরে গেছে? আরেকজন বলেছে, এ দেশে কি এখনো সতী-সাবিত্রী পয়দা হয়নি? আজ এই গলির প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র রক্তে সমুজ্জ্বল। শ্যাম কাউর, জয়নব, পারুল আর বেগম—আজ কেবল তোমরাই এই গলি দিয়ে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওনি বরং তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশও এগিয়ে গেছে। স্বাধীনতার ঝান্ডা আজ এই গলি দিয়ে অতিক্রম করেছে। আজ তোমার দেশ, তোমাদের সভ্যতা, তোমাদের ধর্মের মর্যাদাপূর্ণ রীতিনীতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আজ মানবতার মস্তক গর্বে উঁচু হয়ে উঠেছে, তোমাদের আত্মার প্রতি হাজারো লাখো সালাম।

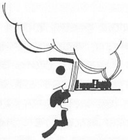

অমৃতসর : স্বাধীনতার পরে

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। লাভ করে স্বাধীনতা। ১৫ আগস্ট সারা ভারতে পালন করা হয় স্বাধীনতা দিবসের উৎসব। আর করাচিতে যখন আজাদ পাকিস্তানের স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল, লাহোরে সেদিনই জ্বলে উঠল আগুন। অমৃতসরে হিন্দু, মুসলমান আর শিখদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারাত্মক আকার ধারণ করে। কারণ, কেউ তাদের কাছে জানতে চায়নি, 'তোমরা কি পৃথক হতে চাও, নাকি শত শত বছর ধরে মিলেমিশে যেভাবে থেকেছ, সেভাবেই থাকবে?' ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যের খুঁটি গেড়ে বসার পর তাদের সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল এই পাঞ্জাবের লোকজন দিয়েই। ঘোড়াও সংগ্রহ করা হয়েছিল সেখান থেকেই। তার বদলে পাঞ্জাবে খাল কাটা হয় আর শিখ সেপাইদের পেনশন দেওয়া হয়। তারা কি কখনো পাঞ্জাবি আমজনতার কাছে তাদের মতামত জানতে চেয়েছে? এসব কিছুর পরপরই রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা আর আন্দোলনের ফলে গণতন্ত্র ফিরে আসে। রাজনীতিকেরা গড়ে তোলেন রাজনৈতিক দল। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় পাঞ্জাবের জনগণের কাছে কোনো কিছুই জিগ্যেস করা হয়নি। কেবল একটি মানচিত্র সামনে নিয়ে দুটুকরো করা হলো পাঞ্জাবকে। রাজনৈতিক নেতা ছিলেন গুজরাটি আর কাশ্মীরি। তাই পাঞ্জাবের মানচিত্র সামনে নিয়ে কলম দিয়ে দাগ কেটে দুটুকরো করে ফেললেন তাঁরা। এই সীমারেখা টেনে দেওয়ার কাজটা তাঁদের কাছে তেমন কষ্টকর কিছু ছিল না। মানচিত্র বা নকশা একটা মামুলি জিনিস। এক টাকা আট আনায় পাঞ্জাবের মানচিত্র কিনতে পাওয়া যায়। তার ওপর রেখা টেনে দেওয়া আরও সহজ কাজ। একটা কাগজের টুকরো, কালির একটা দাগ কীভাবে পাঞ্জাবের দুঃখ বুঝবে! সেই কালির দাগ মানচিত্রকে নয়, বরং পাঞ্জাবের হৃদয়কে চিরে চলে গেছে। পাঞ্জাবে তিন ধর্মের লোকের বসবাস। কিন্তু তাদের হৃদয় ছিল এক ও অভিন্ন। তাদের পোশাকপরিচ্ছদও একই ধরনের।

একই ধরনের ছিল খেতের রোমান্টিক পরিবেশ আর কৃষকদের পঞ্চায়েতি আবেগ। পাঞ্জাবে চলে আসা রীতিনীতি তাদের এক সংস্কৃতি, এক দেশ, এক জাতিসত্তার অস্তিত্বের পরিচয়কেই তুলে ধরত। কিন্তু কেন তাদের গলায় ছুরি চালানো হলো? বছরের পর বছর ধরে কেন তাদের শরীরে, রক্তের শিরা-উপশিরায় ঘৃণার বীজ বপন করা হলো? কেন ধর্মের উগ্রতার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো তাদের মনে? আমরা জানি না, আমরা দুঃখিত। আমরা এ ধরনের নির্যাতনের নিন্দা করি। অত্যাচার, ঘৃণা আর ধর্মীয় উন্মাদনার আগুন জ্বালাতে যারা উসকানি দিয়েছে, তারাই ধ্বংস করেছে পাঞ্জাবের ঐক্যকে, তারাই এখন বর্ষণ করছে কুম্ভীরাশ্রু। এখন পাঞ্জাবের ছেলেরা দিল্লির গলিতে আর করাচির বাজারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। তাদের বাড়ির মেয়েদের সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে, আর তাদের ফসলের খেত বিরান হয়ে গেছে।

জানা গেছে, ভারত ও পাকিস্তান সরকার শরণার্থীদের জন্য বিশ কোটি টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু বিশ টাকা খরচ করেছে। আমাদের জাত ভাইদের ব্যাপারে তারা দারুণ দয়া দেখিয়েছে! আরে বাপু, আমরা নস্যি ব্যবহারেও মাসে বিশ টাকা খরচ করে থাকি। এখন তোমরা ওদের ভিক্ষা দিতে এসেছ, অথচ কিছুদিন আগেও ওরা ছিল ভারতের সবচেয়ে বিত্তবান কৃষক। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা পাঞ্জাবের কৃষাণ, ছাত্র, খেতখামারের মজদুর, দোকানদার, মা, মেয়ে, বউদের কাছে পাঞ্জাবের মানচিত্রের ওপর দাগ দিয়ে সীমারেখা টানার আগে তাদের মতামত কি জানতে চেয়েছ? কিন্তু এখন তারা সেখানে, সেটা তো তাদের দেশ বা মাতৃভূমি নয়, তাদের মাতৃভাষা নয়। ও ভাষার গান তো তাদের নয়, তাহলে তো তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারত। তারা তাদের দুঃখ বুঝত, যারা হিরকে রাঞ্জার কাছ থেকে আর সোহানিকে মাহিয়ালের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ফলে কী বেদনা সইতে হয়েছে, সেটা জানত। পাঞ্জাবের খেতে যারা নিজের হাতে গম উৎপাদন করেছে, কার্পাসের মনোরম দুল বাতাসে দুলতে দেখেছে, তাদের অবস্থা রাজনীতিবিদেরা কি বুঝবে? তাঁরা হলেন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাজনীতিবিদ।

যাক, এই কান্নাকাটির কথা বাদ দিন। মানুষের মানুষ হতে এখনো অনেক দেরি, না হলে একজন সামান্য গল্পকারের এ নিয়ে মাথাব্যথা কেন? মানুষের জীবন, রাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন নিয়ে তার বিচার বিবেচনা করার কী আছে? মেয়েদের সম্ভ্রম থাকুক বা না থাকুক, তাতে কী? শিশুদের গলায় ছুরি চললেই বা তার কী? বরং এসব বাদ দিয়ে তার উচিত ছোটগল্প লেখা, মানুষকে যা আনন্দ দেবে। এ ধরনের বড় বড় বুলি তার মুখে শোভা পায় না।

আপনারা ঠিকই বলেছেন। এবার তাহলে অমৃতসরের স্বাধীনতার কাহিনি শুনুন। উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র জালিয়ানওয়ালাবাগ এই শহরের

বুকেই। শিখদের সবচেয়ে বড় পবিত্র মন্দির অমৃতসরে। সেখানকার হিন্দু, মুসলমান আর শিখরা একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে একপ্রাণ হয়ে অংশ নিয়েছে। বলা হয়ে থাকে, লাহোর যদি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দুর্গ, তাহলে অমৃতসর জাতীয়তার কেন্দ্র। এই জাতীয়তাবোধের বৃহৎ কেন্দ্রের কাহিনি শুনুন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট অমৃতসর স্বাধীন হলো। প্রতিবেশী লাহোরে আগুন জ্বললেও অমৃতসর পেয়েছে স্বাধীনতা। এখানকার বাজারে, বাড়িতে আর দোকানে তেরঙা ঝান্ডা উড়ছে। অমৃতসরের স্বাধীনতাকামী মুসলমানরা স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের মিছিলে ছিল সবার পুরোভাগে। সবার পুরোভাগে ছিল তারা স্বাধীনতাসংগ্রামেও। অমৃতসরকে তখন কেবল আকালি আন্দোলনের অমৃতসর মনে হয়নি। আহরার আন্দোলনেরও অমৃতসর মনে হয়েছে। এটা শুধু ডা. সত্যপালের অমৃতসর নয়, ছিল কিচলু আর হিশামউদ্দীনেরও অমৃতসর। আজ অমৃতসর স্বাধীন। এর আকাশে-বাতাসে আজাদ হিন্দুস্তানের স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে। অমৃতসরের হিন্দু, মুসলমান, শিখ—সবাই একত্রে আনন্দে মাতোয়ারা, জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদরা আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। সন্ধ্যায় যখন প্রদীপ জ্বালানোর উৎসব চলছিল, ভারত ও পাকিস্তান থেকে দুটি স্পেশাল ট্রেন এসে হাজির হলো অমৃতসরে। পাকিস্তান থেকে আসা স্পেশাল ট্রেনে ছিল হিন্দু আর শিখ যাত্রী। ভারত থেকে আসা ট্রেনে ছিল মুসলমান যাত্রী। একেকটি ট্রেনে তাদের সংখ্যা তিন থেকে চার হাজারের মতো হবে। মোট ছয় থেকে সাত হাজার যাত্রীর মধ্যে মাত্র দুই হাজার ছিল জীবিত। বাদবাকি সবাই লাশ হয়ে পড়ে ছিল গাড়িতে। অনেক লাশের মস্তক বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন মস্তকগুলো ট্রেনের কামরার জানালায় জানালায় সারবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পাকিস্তান থেকে আসা ট্রেনে উর্দু হরফে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'হত্যা করা পাকিস্তানের কাছ থেকে শিখে নাও'। আর ভারত থেকে আসা স্পেশাল ট্রেনে লেখা ছিল 'প্রতিশোধ কীভাবে নিতে হয় হিন্দুস্তানের কাছ থেকে শিখে নাও'। এই ব্যানার দেখে শিখদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। তারা দ্রুত শিখ শরণার্থীদের ট্রেন থেকে নামিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। তারপর তারা মুসলমানদের গাড়িতে হামলা চালায়, যারা অর্ধমৃত অবস্থায় ছিল, তাদের অর্ধেকেরও বেশি হামলাকারীদের হাতে প্রাণ হারায়। সামরিক বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ট্রেনে একজন বৃদ্ধা, তাঁর কোলে তার ছোট্ট নাতি। পথে তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে। তাঁর ছেলের বউকে জাটেরা ধরে নিয়ে গেছে। বৃদ্ধার স্বামীকে হামলাকারীরা কেটে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলেছে। কিন্তু আর্তনাদ করা তো দূরের কথা, নীরবে দেখেছেন দৃশ্যটা। চোখে ছিল না পানি আর মনে প্রার্থনাও।

তাঁর ইমান দুর্বল হয়ে পড়েছে, কোনো শক্তি ছিল না। পাথরের মূর্তির মতো তিনি বসে ছিলেন চুপচাপ। মনে হয়েছে, তিনি কিছু শুনছেন না বা দেখছে না। তাঁর কোনো চেতনা ছিল না। শিশুটি বলল, 'দাদি আম্মা, পানি।' দাদি নীরব। শিশুটি চিৎকার করে ওঠে, 'দাদি আম্মা, পানি।' দাদি বললেন, 'বাছা, পাকিস্তানে এলে পানি পাওয়া যাবে।' শিশুটি বলল, 'হিন্দুস্তানে কি পানি পাওয়া যাবে না?' দাদি জবাব দিলেন, 'বাছা, আমাদের দেশে পানি নেই।' শিশুটি আবার প্রশ্ন করে, 'কেন নেই? আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি পানি খাব। পানি, পানি—দাদিমা, আমি পানি খাব।' এই সময় একজন আকালি স্বেচ্ছাসেবক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে রেগে তেরচা চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'পানি খাবে?'

'হ্যাঁ,' ছেলেটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। দাদি ভীত হয়ে বললেন, 'না না, ও আপনাকে কিছুই বলেনি। ও কিছুই চায় না আপনার কাছে। সরদার সাহেব ওকে ছেড়ে দিন। আমার কাছে আর কিছু নেই।' আকালি স্বেচ্ছাসেবক জুতোর তলায় লেগে থাকা রক্ত হাতের তালুতে মাখিয়ে শিশুটির কাছে গিয়ে বলল, 'নাও, তেষ্টা পেয়েছে? এই নাও, খুবই ভালো রক্ত। মুসলমানের রক্ত।' দাদি পিছু হটে যায়, আর শিশুটি কাঁদতে থাকে। দাদি তাঁর হলুদ ওড়না দিয়ে শিশুটিকে আড়াল করে ফেলেন। আকালি স্বেচ্ছাসেবক হাসতে হাসতে চলে যায়। দাদি ভাবছেন, কখন গাড়ি ছাড়বে, হায় খোদা, কখন পাকিস্তানে গিয়ে তারা পৌঁছাবে? এই সময় একজন হিন্দু পানির গ্লাস নিয়ে এসে বলল, 'নাও, শিশুটিকে পানি পান করাও।' ছেলেটা তার দুহাত এগিয়ে দেয়। তার ঠোঁট জোড়া কাঁপছিল। চোখের মণি যেন কোটর থেকে ফেটে বেরিয়ে পড়বে। হিন্দু লোকটা এ সময় তার ধরা গ্লাসটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'এই পানির দাম দিতে হবে। মুসলমান ছেলেকে বিনা মূল্যে পানি খাওয়ানো যাবে না। এই গ্লাসের পানির মূল্য পঞ্চাশ রুপি।' দাদি মিনতি করে বললেন, 'পঞ্চাশ রুপি! বাবা, আমার কাছে একটি রুপোর কানাকড়িও নেই। আমি পঞ্চাশ রুপি কোথায় পাব?'

'পানি, পানি, আমাকে পানি দাও। পানির গ্লাসটা আমাকে দাও। দাদিমা দেখো, ও আমাকে পানি খেতে দিচ্ছে না।'

একজন যাত্রী বলল, 'আমাকে দাও, আমার কাছে পঞ্চাশ রুপি আছে।'

হিন্দু লোকটি হাসতে হাসতে বলল, 'পঞ্চাশ রুপি শিশুটির জন্য। তোমার জন্য এক গ্লাস পানির দাম এক শ রুপি।'

'ঠিক আছে, এই নাও এক শ রুপি।'

এক শ রুপি দিয়ে সেই মুসলমান যাত্রী গ্লাসটা কিনে নেয়। তারপর পানি খেতে থাকে। শিশুটি এই দৃশ্য হতবাক হয়ে দেখে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'পানি, পানি, দাদি আম্মা পানি।'

'খোদা আর রসুলের দোহাই, শিশুটিকে কয়েক ফোঁটা পানি দাও।'

নিষ্ঠুর মুসলমান যাত্রীটি এক লহমায় গ্লাসের সব পানি খেয়ে তার চোখ দুটো বন্ধ করে। কী হয়, শূন্য গ্লাসটা তার হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ে যায়। ফলে কয়েক ফোঁটা পানি ছিটকে পড়ে মেঝেতেও। শিশুটি দাদির কোল থেকে মেঝের ওপর নেমে পড়ে। হামা দিয়ে এগিয়ে যায় শূন্য গ্লাসটির দিকে। প্রথমে সে চাটতে থাকে। তারপর মেঝের ওপর পড়া পানি জিব দিয়ে চেটে খাওয়ার চেষ্টা করে। তারপর জোরে জোরে 'পানি, দাদি পানি, পানি' বলে চিৎকার করতে থাকে। পানি ছিল, আবার কোথাও ছিল না বললেও চলে। যেমন হিন্দু শরণার্থীদের জন্য পানির ব্যবস্থা থাকলেও মুসলমানদের জন্য ছিল না। রেল স্টেশনে সারি সারি পানির মটকা সাজানো। পানির নল খোলা। হিন্দুযাত্রীদের মধ্যে পানি বিলি করা হচ্ছে। কিন্তু মুসলমান মোহাজিরদের জন্য কোনো পানি নেই। কারণ, পাঞ্জাবের মানচিত্রের মাঝ বরাবর একটা কালো দাগ টেনে দেওয়া হয়েছে। কাল ওরা ছিল ভাই ভাই, এখন পরস্পরের শত্রু। কাল যাকে আমরা বোন বলেছি, আজ সে পতিতার চেয়ে নিকৃষ্টতর কিছু। কাল যাকে মা বলেছে, আজ সেই ছেলে তার গলায় ছুরি চালাচ্ছে।

পানি হিন্দুস্তানেও আছে, পাকিস্তানেও আছে; তার পরও পানি কোথাও নেই। কেননা, চোখের পানি পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। আর এই দুটি দেশ এখন ঘৃণার মরুভূমি। এই মরুভূমির তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে চলাচল করা মুসাফিরের দল পড়েছে দারুণ বালুর ঝড়ে। পানি আছে কিন্তু সে পানি হলো মদ। যে দেশে লাচ্ছি ও দুধ পানির মতো বয়ে যায়, সেখানে আজ পানি পাওয়া যাচ্ছে না। আর সেই দেশে আজ শিশুরা পিপাসায় ছটফট করে মারা যাচ্ছে। হৃদয়ের নদী শুকিয়ে গেছে। তাই পানি ছিল আবার পানি নেই বললেও চলে।

এবার এল স্বাধীনতার রাত। দেওয়ালি উৎসবেও এত প্রদীপ জ্বলে না। কারণ দেওয়ালি উৎসবে তো শুধু প্রদীপ জ্বালানো হয়। এখানে বাড়ির পর বাড়ি আর বসতি জ্বলছে। দেওয়ালি উৎসবে আতশবাজি পোড়ানো হয়, পটকা ফোটানো হয়। এখন বোমা ফাটানো হচ্ছে, আর মেশিনগানের গুলি চলছে। ইংরেজ রাজত্বে কোনোক্রমে একটি পিস্তলও পাওয়া যেত না। আজাদির প্রথম রাতে এতগুলো বোমা, হাতবোমা, স্টেনগান, ব্রেনগান কোথা থেকে এল? এসব অস্ত্র ব্রিটিশ ও মার্কিন কোম্পানির তৈরি।

আজ আজাদির প্রথম রাতে হিন্দুস্তানিরা পাকিস্তানিদের বুক বিদীর্ণ করছে গুলি চালিয়ে। ব্রিটেন আর আমেরিকা অস্ত্র তৈরি করছে আর ভারতীয় ও পাকিস্তানিরা পরস্পর লড়াইয়ে মত্ত। শাবাশ, বাহাদুর ভাইয়েরা, লড়াই জোরদার হলে ভালো! কারণ এতে বিদেশিদের অস্ত্র বিক্রির মুনাফা বাড়বে। চীনের লোকজন নিজেরা নিজেদের মধ্যে লড়ছে। ভারতীয় আর পাকিস্তানিরা কেন লড়বে না? ওরা এশীয়, তোমরাও এশীয়। এশিয়ার অধিবাসীদের মান-সম্মান বজায় রাখতে হবে তো!

তোমরা লড়াই না করলে এশিয়াবাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরে যাবে। তাহলে সাম্রাজ্যবাদের কারখানায় তৈরি অস্ত্র বিক্রিতে ভাটা পড়বে, তাদের জীবনে আনন্দ-হুল্লোড় কমে যাবে। তাই পরস্পর লড়াইয়ে মত্ত থাকো। আগে তো বিদেশ থেকে কাপড়, কাচের আসবাব, সুগন্ধিদ্রব্য ভারতে পাঠাত। এখন ব্রিটেন, আমেরিকা তোমাদের কাছে অস্ত্র, বোমা আর উড়োজাহাজ, কার্তুজ পাঠাবে। কারণ ভারত এখন স্বাধীন দেশ। সশস্ত্র হিন্দু এবং শিখ স্বেচ্ছাসেবকেরা মুসলমানদের বাড়িতে আগুন দিচ্ছে আর হিন্দুরা স্লোগান দিচ্ছে। মুসলমানেরা তাদের বাড়িঘরের আড়াল থেকে মেশিনগানের পাল্টা গুলি চালাচ্ছে, আর ছুড়ছে হাতবোমা। স্বাধীনতা দিবসের রাত থেকে শুরু করে তিন-চার দিন পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে এভাবেই। হিন্দু আর শিখদের সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরাও আশপাশের রাজ্য থেকে এসে হাজির হয়।

মুসলমানেরা তাদের বাড়িঘর খালি করে চলে যাচ্ছে। আগুনে পুড়ছে সেইসব বাড়িঘর, মহল্লা আর হাটবাজার। জ্বলছে হিন্দুদের বাড়ি, মুসলমানদের বাড়ি, শিখদের বাড়ি—সবই। কিন্তু শেষের দিকে মুসলমানদের বাড়িঘরই বেশি করে আগুনে পুড়েছে। এই অবস্থায় হাজার হাজার মুসলমান বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে শহর ছেড়ে ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। সেই তখন যা কিছু ঘটেছে, ইতিহাসে তাকে 'অমৃতসরের গণহত্যা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যা হোক, সামরিক বাহিনী এসে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গণহত্যা বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক ক্যাম্পে আশ্রয় নিলে হিন্দুদের বলা হতে থাকে 'শরণার্থী' আর মুসলমানদের 'মোহাজির'। কিন্তু তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করা হলেও দুই সম্প্রদায়েরই বিপদ একই ধরনের উদ্দেশ্য, বিপদের সময়ও যেন দুটি সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হতে না পারে। দুটি ক্যাম্পের ঠাঁই মিলেছে খোলা আকাশের নিচে। মাথার ওপর ছাদ ছিল না, আর ছিল না আলোর ব্যবস্থা। শোবার জন্য ছিল না বিছানাপত্র আর পায়খানার ব্যবস্থা। এখানে হিন্দু ও শিখদের ক্যাম্পকে বলা হয় শরণার্থী ক্যাম্প, মুসলমানদেরটিকে বলা হয় 'মোহাজেরিন' ক্যাম্প। হিন্দু শরণার্থী শিবিরে স্বাধীনতা দিবসের রাতে একজন বৃদ্ধা মা প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ছেলের সামনেই মারা যান। তারা এসেছিল পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল জন পনেরো। তাদের কাছে বিছানাপত্র ছিল। ছিল খাবারদাবারও। ট্রাকভর্তি কাপড়চোপড়, টাকাপয়সার পুঁটলিও ছিল সঙ্গে। মেয়েদের গায়ে আর কানে ছিল অলংকার। একটি ছেলের কাছে ছিল একটা সাইকেলও। সব মিলিয়ে পনেরো জনের পরিবার।

গুজরানওয়ালা পর্যন্ত পৌছাতে পৌছাতে পনেরো জনের মধ্যে মাত্র দশ জন বেঁচে ছিল। তারপর অলংকার আর মেয়েদের সম্ভ্রম লুট করার কাজ চলেছে সমানে। লাহোরে এসে পৌছানো পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ছয় জনে দাঁড়ায়।

জামাকাপড়, বিছানাপত্র, এমনকি ছেলেটির সাইকেল পর্যন্ত ছিনতাই হয়ে যায়। এ জন্য ছেলেটির মনে দারুণ দুঃখ। আর তারা যখন মোগলপুরা ছেড়ে যাচ্ছে, তখন পনেরো সদস্যের পরিবারের মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র দুজন। মা ও ছেলে আর একটা লেপ। মৃত্যুর সময় বৃদ্ধার গায়ে লেপটি জড়ানো ছিল। স্বাধীনতার প্রথম রাতে, মহিলাটি যখন মারা যাচ্ছেন, ছেলেটি তখন তার মার শিয়রে চুপচাপ বসে ছিল। সেও কাঁপছিল জ্বরে। তখন তার কান্নাকাটি ছিল না। আর চোখের পানিও শুকিয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। মায়ের মৃত্যুর পর সে লেপটি নিজের গায়ে জড়িয়ে ক্যাম্পের অন্য পাশে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর একজন স্বেচ্ছাসেবক তার কাছে এসে বলল, 'ওই যে ওদিকে তোমার মা মরে পড়ে আছে?' ছেলেটি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'মা! আমি জানি না, কে সে!' আর লেপটিকে গায়ে আরও ভালোভাবে চেপে ধরে বলল, 'সে আমার মা নয়। এটা আমার লেপ। এই লেপ আমি কাউকে দেব না। এই লেপ আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কাউকে দেব না এই লেপ।'

একটি লেপ, একজন মা, একজন মৃত মানুষ। এমন একদিন হয়তো আসবে, আপনাদের আরেকটি নতুন গল্প সেদিন শোনাতে হবে। মুসলমানেরা যখন পালিয়ে যায়, তাদের বাড়িঘরে লুটপাট শুরু হয়ে যায়। এমন কোনো ভদ্রলোক ছিল না, যারা এই লুটপাটে অংশ নেয়নি। স্বাধীনতা পাওয়ার তিন দিনের দিন, আমি গলির বাইরে এলাম কল থেকে গরুকে পানি খাওয়ানোর জন্য। এক হাতে বালতি। অন্য হাতে গরুর গলার রশি। গলির বাইরে মোড়ে এসে আমি পৌরসভার ল্যাম্পপোস্টে গরুটাকে বেঁধে, পানির কলের দিকে ঘুরে দাঁড়াই। উদ্দেশ্য, বালতি ভরে পানি আনা। কিছুক্ষণ পর এসে দেখি, গরুটা উধাও। এদিক-ওদিক, আশপাশে খুঁজে দেখলাম। কোথাও তার হদিস নেই। হঠাৎ পাশের বাড়ির আঙিনার দিকে আমার চোখ পড়তেই দেখলাম, আমার গরুটাকে পাশের বাড়ির আঙিনায় বেঁধে রাখা হয়েছে। আমি সেখানে ছুটে যেতেই সরদারজি গোছের একজন বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি কে?' আমি বললাম, 'আমি গরুটাকে রাস্তার পাশে খুঁটিতে বেঁধে রেখে পানি আনতে গিয়েছিলাম। এই গরুটা তো আমার সরদারজি।'

সরদারজি মুচকি হেসে বলল, 'কোনো অসুবিধা নেই। আমি মনে করেছিলাম, কোনো মুসলমানের গরু। আপনার গরু হয়ে থাকলে নিয়ে যান।' কথাগুলো বলেই তিনি গরুর গলার রশিটা খুলে আমার হাতে তুলে দেন। আমি চলে আসছি, তখন সরদারজিকে আবারও বলতে শোনা গেল, 'মাফ করবেন, আমি মনে করেছিলাম, কোনো মুসলমানের গরু।'

এই ঘটনা আমি বন্ধু সরদার সুন্দর সিংকে শোনালে হাসতে হাসতে তার একেবারে কাহিল দশা। আমি বললাম, 'এতে হাসবার কী আছে?' সে আরও

জোরে হাসতে থাকে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, সে একজন কমিউনিস্ট। তাই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ থেকে অনেক দূরে থাকে। সে আমার আঙুলে-গোনা বন্ধুদের একজন, যারা লুটতরাজে অংশ নেয়নি। সে বলল, 'তা না, এ জন্য আমি হাসছি না। আসলে একই ঘটনা আমার বেলাতেও আজ ঘটেছে। আমি বাজারের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় ভাবলাম, সামনে সরদার সভেরা সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে যাই। পুরোনো গদর পার্টির নেতা। সে তার গ্রামে তিন-চার শ মুসলমানকে আশ্রয় দিয়েছে। তার কাছে জানতে পারব, তাদের কী অবস্থা! কীভাবে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে এনে মোহাজির ক্যাম্পে তোলা যায়। এ কথা ভেবে, আমি মোহাম্মদ রাজ্জাকের জুতোর দোকানের সামনে গাড়ি রেখে নেমে পড়ি (দোকানটি অবশ্য এর মধ্যেই লুট হয়েছে)। তারপর দোকানের পেছনের বসতবাড়িতে গিয়ে ঢুকি। সেখান থেকে মিনিট কয়েক পর ফিরে আসি। কারণ, বাবাজি বাড়িতে ছিলেন না। ফিরে এসে দেখি, গাড়িটা নেই। একটু আগেই তো গাড়িটা এখানে রেখেছিলাম! জিজ্ঞাসাবাদে কেউ কিছু বলল না। বাজারের শেষ মাথায় আসার পর দেখলাম, আমার গাড়ি একটা জিপের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। জিপে বসে ছিলেন বিখ্যাত জাতীয় নেতা সরদার সভেরা সিং।

আমি তাঁকে জিগ্যেস করি, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমার নিজের গ্রামে যাচ্ছি,' সরদারজি জবাব দিলেন।

আমি বললাম, 'আমার গাড়িও কি আপনার গ্রামে যাচ্ছে?'

'কোন গাড়ি? পেছনে বেঁধে নেওয়া গাড়িটা। মাফ করবেন, আমি চিনতে পারিনি। রাজ্জাকের দোকানের সামনে ওটা রাখা ছিল। আমি ভাবলাম, কোনো মুসলমানের গাড়ি। তাই জিপের পেছনে বেঁধে নিয়েছিলাম।' হা-হা করে হেসে বললেন, 'আমি গাড়িটা নিজের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। ভালোই হয়েছে, তুমি সময় মতো এসে গেছ।' আমি আমার গাড়ি খুলে নিয়ে বললাম, 'এখন কোথায় যাবেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'অন্য কোথাও যাব। কোথাও না কোথাও মালামাল পেয়ে যাবই।'

সরদার সভেরা সিং জাতীয় নেতা। জেল খেটেছেন। জরিমানাও দিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এই ঘটনা শোনানোর পর সুন্দর সিং বলল, 'মজার বিষয়, তাই না।' লুটতরাজ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, আমাদের জাতীয় নেতারাও এ কাজে পিছিয়ে থাকেননি। আমাদের রাজনৈতিক দলের কর্মীদের একটা অংশও এই লুটতরাজ, গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নিয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারা না গেলে দুটো জাতি দু-চার বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

সুন্দর সিংকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে। আমি সেখান থেকে উঠে চলে যাই। পথে কলেজ রোডে একজন ধনী মুসলমানের বাড়িতে লুটপাট চলছে। মালপত্রের স্তূপ থেকে লোকজন ইচ্ছেমতো আসবাবপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি তাকিয়ে আছি, কয়েক মিনিটের মধ্যেই লুটেরাদের হাতে মালামাল সব উধাও হয়ে যায়। এমনকি পথচারীরাও বাড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের সেপাইদেরও বাড়ি থেকে বের হতে দেখা যায়। ব্যাপারটা দেখে সবাই তো হতবাক। পুলিশের সেপাইদের হাতে কয়েকটা মোজা, আর রেশমি টাই। একটা কোটের হ্যাঙ্গারে ঝোলানো একটা মাফলার। পুলিশের সেপাইরা হেসে লোকজনকে বলছিল, 'এখন কোথায় যাচ্ছ, বাড়ির ভেতরের জিনিসপত্রের সবই লুট হয়ে গেছে।' একজন লোককে আমার সামনে দিয়ে বাড়িটার দিকে ছুটে যেতে দেখলাম। আমাকে পেছন দিক থেকে বলল, 'দেখুন, পৃথিবীর মানুষজন কেমন পাগল হয়ে গেছে।' আমার সামনে দিয়ে একজন দুধওয়ালা যাচ্ছিল। তার ভাগে জুটেছে কিছু বই। বইগুলো সে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জিগ্যেস করি, 'বই দিয়ে তুমি কী করবে? তুমি কি পড়তে পারো।'

'না, বাবুজি,' দুধওয়ালার উত্তর।

'তাহলে?'

বইগুলোর দিকে বিরাগ-মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'আমি কী করব বাবুজি, যেখানেই যাই, গিয়ে দেখি, লোকজন ভালো জিনিসপত্র আগেভাগেই তুলে নিয়ে গেছে। আমার ভাগ্য খারাপ!' সে আবার রাগী রাগী মুখভঙ্গি করে বইগুলোর দিকে তাকায়। ইচ্ছে করছিল সেগুলো রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিতে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'যা হোক, এই মোটা মোটা বইগুলো উনুনে ভালো জ্বলবে। রাতে কাঠের বদলে রান্নার কাজেও লাগবে। তখন আর কাঠের প্রয়োজন হবে না।' ভালো ভালো সব বই উনুনের আগুনে পুড়ে ছাই হবে। অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, রুশো, শেক্সপিয়ারের মূল্যবান সব বই চুলোর আগুনের খোরাক হলো।

বিকেলে বাজার জনশূন্য। একটু পরেই কারফিউ জারি হবে। আমি তাড়াতাড়ি রামদাস গলি থেকে বের হয়ে পবিত্র গুরুদুয়ারাকে সম্মান জানিয়ে নিজের বাড়ির দিকে যাত্রা করি। সামনে অন্ধকার গলি। এই গলি দিয়ে রোজ লোকজনকে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটু মাটিতে ঘষটে ঘষটে জালিয়ানওয়ালাবাগের দিকে যেতে হয়। আমি ওই গলির দিকে ঘুরে যেতে থাকি। গলিটা ছিল খুবই সংকীর্ণ আর অন্ধকার। সেখানে মুসলমানদের আট-দশটা বাড়ি ছিল। বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার আগে করা হয়েছে লুটপাট। সবগুলো বাড়ির দরজা ছিল খোলা। জানালাগুলো ছিল ভাঙা। আগুনে পুড়ে অনেক জায়গার বাড়ির ছাদে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। গলি পথ জনশূন্য। সুনসান নীরবতা। গলির মধ্যে পড়ে

আছে অনেক মেয়েমানুষের লাশ। আমি ঘুরে দাঁড়াই। এ সময় শুনতে পাই একজন বৃদ্ধার আর্তনাদ। লাশের মধ্যে একজন আহত বৃদ্ধা ছটফট করছেন। আমি তাঁকে টেনে তুলতেই তিনি বললেন, 'পানি দাও বাবা।' আমি দুই আঁজলা ভরে পানি নিয়ে আসি। পবিত্র গুরুদুয়ারার সামনে পানির নল ছিল। আমি আঁজলা থেকে পানি তাঁর ঠোঁট বরাবর ঢেলে দিই। বুড়ি বললেন, 'আল্লা তোমাকে রহম করুক। তুমি কে বাবা? যাক, তুমি যে-ই হও না কেন, আল্লা তোমাকে রহম করবে বাবা। এ মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের প্রার্থনা, এক থা মনে রেখো।' আমি তাঁকে ওঠানোর চেষ্টা করে বলি, 'কোথায় আঘাত পেয়েছ তুমি?' বৃদ্ধা বলল, 'আমাকে তুলতে চেষ্টা কোরো না। আমি এখানেই মরব। এখানেই আমার ছেলের বউ আর ছেলে মরে পড়ে আছে। কী জানি বললে বাবা, আঘাত পাওয়ার কথা! হ্যাঁ বাবা, ক্ষত বড্ড গভীর আর মারাত্মক। তোমরা এর আন্দাজ করতে পারবে না। খোদা তোমাদের ক্ষমা করবেন না।'

'আমাকে ক্ষমা করে দাও মা,' আমি বললাম। মনে হয় বৃদ্ধার কানে কথাগুলো যায়নি। বৃদ্ধা নিজে নিজেই বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, 'প্রথমে ওরা আমাদের পুরুষদের হত্যা করে। তারপর আমাদের বাড়িঘরের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। তারপর আমাদের টেনেহিঁচড়ে গলির মধ্যে নিয়ে আসে। আর এই গলির পথে এই পবিত্র গুরুদুয়ারার সামনে তারা আমাদের সম্ভ্রম লুট করে। আমাদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমি তো ওদের দাদির বয়সী। ওরা আমাকে পর্যন্ত ক্ষমা করেনি। আমারও ইজ্জত লুট করেছে।' হঠাৎ তিনি আমার শার্টের আস্তিন ধরে টান দিয়ে বললেন, 'তুমি জানো, এটা অমৃতসর শহর। এটা আমার শহর। এই পবিত্র গুরুদুয়ারাকে প্রণাম জানাই, সম্মান করি। আমাদের গলিতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ বসবাস করে। আমরা কয়েক পুরুষ ধরে এখানে বসবাস করছি। আমরা সব সময় শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে দিন কাটিয়েছি। কোনো অঘটন ঘটেনি।'

'আমার ধর্মের লোকজনকে ক্ষমা করো মা', আমি বললাম। বৃদ্ধা বললেন, 'তুমি জানো, আমি কে? আমি জয়নবের মা। তুমি জানো, জয়নব কে? জয়নব সেই মেয়ে, যে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের দিন এই গলিতে গোরা সৈন্যদের কাছে মাথা নত করেনি। নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও জাতির জন্য মাথা উঁচু করে এই গলি পার হতে গিয়ে এখানেই শহীদ হয়েছে। আমি জয়নবের মা। আমি সহজে তোমাকে ছাড়ব না। আমাকে সাহায্য করো, আমাকে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি আমার নিজের ছেলের বউ আর ছেলের লুট করা ইজ্জতের প্রশ্ন নিয়ে রাজনীতিবিদদের কাছে যাব। আমাকে তুলে ধরো। আমি ওদের বলব, আমি জয়নবের মা, আমি অমৃতসরের মা। আমি পাঞ্জাবের মা। তোমরা আমার ইজ্জত লুটে মুখে কালি লেপে দিয়েছ। তোমরা আমার ছেলের বউ ও ছেলেদের পবিত্র আত্মাকে জাহান্নামের আগুনে ছুড়ে ফেলেছ। আমি ওদের কাছে প্রশ্ন রাখব, জয়নব

কি দেশের আজাদির জন্য জীবন উৎসর্গ করেনি? আমি জয়নবের মা।' কথাগুলো বলার পরপরই তাঁর মাথা আমার কোলে ঢলে পড়ে। তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে বৃদ্ধা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। জয়নবের মা আমার কোলে মরে পড়ে আছেন। তাঁর মুখের রক্তে আমার শার্ট রঞ্জিত। আমি জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি বসে আছি।

এ সময় সিদ্দিক ও ওম প্রকাশের ছবি আমার কল্পনায় ভেসে ওঠে, ভেসে ওঠে গর্বিত জয়নবের প্রতিচ্ছবি। আর এই শহীদরা আমাকে যেন বলতে থাকে, আমরা আবার আসব। সিদ্দিক ও ওম প্রকাশ আবার আসবে। সন্ধ্যায় শ্যাম কাউর, জয়নব, পারুল, বেগম—সবাই ফিরে আসবে নিজেদের সতীত্বের পবিত্রতা আর পবিত্র দাগহীন আত্মা নিয়ে। কারণ, আমরা মানুষ। আমরা সারা বিশ্বের সৃষ্টির পতাকাবাহী। কেউ সেই সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে পারবে না। কেউ তাদের ইজ্জত লুটতে পারে না, কেউ তাদের লুট করতে পারে না। কারণ, আমরা সৃষ্টি, তোমরা হলে ধ্বংসকারী, তোমরা বর্বর পশু, তোমাদের মৃত্যু অবশ্যই হবে। কিন্তু আমরা মরব না। কারণ মানুষ মরতে পারে না। তারা পশু নয়। তারা হলো পবিত্র আত্মা। সৃষ্টিকর্তার অর্জন। সারা বিশ্বের গৌরব।

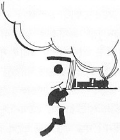

পণ্ডিত নেহরু ও জিন্নাহর প্রতি পতিতার খোলা চিঠি

আমি আশা করি, এর আগে আপনারা কোনো পতিতার চিঠি পাননি। আমার ধারণা, আপনারা আমার মতো খুবই ঘৃণিত কোনো নারীর চেহারা কোনো দিন দেখেননি। আমি, আপনাদের কাছে আমার খোলা চিঠি লেখা অভদ্রতা। কিন্তু কী করব, পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে। দুটি মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তিত। তাই এই চিঠি না লিখে থাকতে পারিনি। বেলা ও বতুল নামের দুটি মেয়ে এই চিঠি আমাকে লিখতে বাধ্য করেছে, এ জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। একজন অধঃপতিত নারী আপনাদের কাছে সাহস করে চিঠি লিখছে বলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার চিঠির কোনো বাক্য যদি আপনাদের অপছন্দ হয়, তাহলে আমার সেই অপারগতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বেলা ও বতুল কেন আমাকে দিয়ে এই চিঠি লেখাচ্ছে? মেয়ে দুটি কে? এবং তাদের জরুরি প্রয়োজন এত বেশিই বা কেন? আমি আমার পাপী-জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করতে চাই না। কখন কী পরিস্থিতিতে আমি পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছি আমি সে কথাও বলতে চাই না। আমি ভদ্রতার মুখোশ পরে আপনাদের কাছে মিথ্যে আবেদন জানাতে আসিনি। আমি আপনাদের সহমর্মিতার কথা জেনে নিজের সাফাই গেয়ে মিথ্যে ভালোবাসার গল্প শোনাতে চাই না। আপনাদের কাছে পতিতাদের জীবন-রহস্য খুলে বলার জন্যও এ চিঠি লেখা নয়। আমার নিজের সাফাই গাওয়ার জন্যও কিছু বলব না। বেলা আর বতুলের জীবনে ভবিষ্যতে প্রভাব পড়তে পারে, আমি নিজের সম্পর্কে এমন সব কথাই আপনাদের জানাতে চাই।

আপনারা কয়েকবার বোম্বে এসেছেন। জিন্নাহ সাহেব তো বোম্বাই অনেকবার দেখেছেন কিন্তু আমরা যেখানে বসবাস করি, আমাদের সেই পতিতালয় নিশ্চয়ই তিনি দেখেননি। আমাদের পতিতালয়টি ফারেস রোডে। গ্রান্ট রোড আর

মদনপুরার মাঝখানে এই ফারেস রোড। আর গ্রান্ট রোডের বিপরীতেই লেমিংটন রোড আর অপেরা হাউস। এগুলো মেরিন ড্রাইভ আর ফোর্ট এলাকা। এখানে বোম্বাইয়ের অভিজাত ভদ্রলোকদের বসবাস। মদনপুরা এলাকার অধিবাসীরা গরিব। ফারেস রোডের মাঝামাঝি মদনপুরা। ফলে ধনী আর গরিব সবাই সুবিধা ভোগ করে। অবশ্য ফারেস রোড মদনপুরার বেশি কাছাকাছি। কারণ দারিদ্র্য আর পতিতার মধ্যে যে দূরত্ব, সেটা সব সময়ই কম হয়ে থাকে। এই পতিতালয় তেমন ছিমছাম আর উন্নত মানের নয়। এখানে বসবাস করা পতিতারাও তেমন সুন্দরী নয়। পতিতালয়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে ট্রাম লাইন। ঘড় ঘড় শব্দ তুলে রাত-দিন তার চলাচল। এখানকার অলি-গলিতে সব সময়ই ভবঘুরে তরুণ, কুকুর, বেকার আর অপরাধ-জগতের পেশাদার লোকজনের ঘোরাফেরা। রাজ্যের খোঁড়া কোকেনসেবী, মদ্যপ, তামাশা দেখার লোক, কানা, পঙ্গু আর পকেটমারের আড্ডা এই পতিতালয়ে। নোংরা হোটেল, ফুটপাতে ময়লা আবর্জনার স্তূপ, আর ভনভনানো মাছির রাজত্ব। কাঠ আর কয়লার গুদাম, পেশাদার দালাল, চুড়িওয়ালা, সিনেমার ছবিওয়ালা, পুরোনো ছেঁড়া বই বিক্রেতা, তুকতাক মন্ত্রপড়া তাগাতাবিজওয়ালা আর উলঙ্গ পোস্টারের দোকানদার, চীনা আর মুসলিম সেলুনের দোকান, বিশ্রী ভাষায় গালাগালাজরত নেংটি পরা কুস্তিগির, অর্থাৎ আমাদের সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধির দেখা পাবেন এই ফারেস রোডে। এ কথা সত্যি, আপনারা এখানে কেন আসবেন? কোনো ভদ্রলোক এদিকে কখনো আসে না। ভদ্রলোকদের সবাই থাকেন গ্রান্ট রোডের ওপারে। মালাবার হিলের সেটা খুবই অভিজাত একটা এলাকা।

আমি একবার জিন্নাহ সাহেবের বাংলোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে মাথা নুইয়ে সালাম করেছি, আমার সঙ্গে বতুলও ছিল। বতুল জিন্নাহ সাহেবের দারুণ ভক্ত। এতটাই ভক্ত যে ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। আল্লাহ আর রসুলের পর বতুলের যদি অন্য কারও ওপর সীমাহীন বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, সে আর কেউ নন—জিন্নাহ। বতুল জিন্নাহ সাহেবের ছবি লকেটে লাগিয়ে বুকে লটকে রেখেছে। তার লক্ষ্য খুবই মহৎ। বতুলের বয়স এখন এগার। কিশোরী মাত্র। ফারেস রোডের লোকজনের কুদৃষ্টি পড়েছে তার ওপর। যা-হোক, সে কথা আপনাকে পরে বলব।

এই ফারেস রোডেই আমি থাকি। এখানকার পশ্চিম দিকের কোনায় চীনা সেলুন। এর পাশেই এক অন্ধকার গলির মোড়ে আমার দোকান। লোকে অবশ্য আমার কুঠুরিকে দোকানই বলে। আমি আপনাদের কাছে কী লুকোব, আপনারা বুদ্ধিমান মানুষ। কেবল বলতে চাই, যেখানটায় আমার দোকান, সেখানে আমার বেচাকেনা চলে, স্বর্ণকার, সবজি বিক্রেতা, ফল বিক্রেতা অথবা দোকানদার যেভাবে কেনাবেচা করে, ঠিক সেইভাবে। সব ব্যবসায়ী যেভাবে গাহককে খুশি

করার চেষ্টা করে, আর নিজের লাভের কথা চিন্তা করে, আমার ব্যবসাও ঠিক সেই ধরনের। পার্থক্য কেবল এইটুকু যে আমি আমি কালোবাজারি করি না। অতএব, অন্য সব ব্যবসায়ী আর আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আমার দোকান এমন এক গলিতে, যেখানে যেতে রাতের বেলা শুধু নয়, দিনের বেলায়ও একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খায়। এই অন্ধকার গলিতে লোকজন মন খুলে মদ খায়, আর বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করে। কথায় কথায় এখানে ঝগড়া হয় আর চলে চাকু মারামারি, খুনখারাবি। এমন কিছু হলে তার জের চলে দু-তিন দিন ধরে। এখানে সব সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয়। আমি তেমন সম্ভ্রান্ত পতিতা নই। ওরলির সমুদ্রতীরে গিয়ে আমার বাড়িভাড়া নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমি একজন মামুলি ধরনের পতিতা। সারা ভারতবর্ষ আমি দেখেছি, অনেক ঘাটের পানি খেয়েছি, আর সব ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। দশ বছর হলো আমি বোম্বাই শহরে থাকি। এই ফারেস রোডের দোকানই আমার বাড়িঘর। এটা তেমন ভালো জায়গা নয়। তবুও মাসে আমার আয় ছয় হাজার রুপি। পরিবেশ নোংরা, চারদিকে কাদা আর ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। মালিকবিহীন ভবঘুরে কুকুরের দল গাহকদের আক্রমণ করার জন্য সব সময় যেন মুখিয়েই থাকে। তার পরও আমার মাসিক আয় ছয় হাজার রুপি।

একতলা বাড়িতে আমার এই দোকান। এর দুটি কামরা। সামনের কামরা বৈঠকখানা। সেখানে আমি নাচ-গান করি আর গাহকদের মনোরঞ্জন করি। পেছনের কামরাটা আমার শোবার ঘর। তারপরেই বাবুর্চিখানা আর গোসলখানা। কামরার এক কোনায় হাঁড়িপাতিল আর অন্যদিকে একটা বড়সড়ো খাট পাতা। তার নিচে ছোট একটা পালঙ্ক আর তার নিচে আমার কাপড়ের সিন্দুক।

বাইরের কামরায় বিদ্যুতের বাতি জ্বলে। কিন্তু ভেতরের কামরাটি অন্ধকার। বাড়ির মালিক দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কামরাগুলো হোয়াইটওয়াশ করেনি। আদৌ করবে কি না, সন্দেহ। আমার সময় কোথায়? সারা রাত নাচ-গান করি আর দিনের পুরোটা বেলা ঘুমিয়ে কাটাই। বেলা আর বতুলকে পেছনের কামরায় রেখেছি। বেশির ভাগ গাহক যখন ভেতরের কামরায় মুখ ধুতে যায়, তখন বেলা ও বতুল চোখ বড় বড় করে ওদের দিকে তাকায়। তাদের চাহনি যা বলতে চায়, আমার চিঠিতেও সেই একই বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। ওরা এখন আমার কাছে না থাকলে আমার মতো পাপী মেয়ে মানুষ আপনাদের কাছে বেয়াদবের মতো চিঠি লিখত না। জানি, পৃথিবীর লোকজন আমাকে ছি-ছি করবে, হয়তো আমার চিঠি আপনার কাছে নাও পৌঁছাতে পারে। তবুও আমি নাচার। বেলা ও বতুলের ইচ্ছানুসারে এই চিঠি আমাকে লিখতে হচ্ছে। আপনারা হয়তো ভাবছেন, বেলা ও বতুল আমার মেয়ে। কথাটা সত্য নয়। আমার কোনো মেয়ে নেই। আমি এই মেয়ে দুটিকে দাঙ্গার সময় দালালের কাছ থেকে কিনেছি। তখন হিন্দু-মুসলমানের

দাঙ্গা চলছিল। গ্রান্ট রোড আর ফারেস রোডে এবং মদনপুরায় মানুষের রক্ত পানির স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছিল। সেই তখনই আমি একজন মুসলমান দালালের কাছ থেকে বেলাকে তিন শ টাকায় কিনেছি। দালালটি ওকে দিল্লি থেকে এনেছিল। বেলার মা-বাবা সেখানে থাকত। তারা রাওয়ালপিন্ডির রাজাবাজারের পেছনে পুঞ্চ হাউসের সামনের গলির বাসিন্দা ছিল। মধ্যবিত্ত পরিবার অথচ অত্যন্ত ভদ্র। বেলা ছিল বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। রাওয়ালপিন্ডিতে যখন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়, মুসলমানরা যখন হিন্দুদের পাইকারি হারে হত্যা করছে, বেলা তখন ক্লাস ফোরের ছাত্রী। সেটা ছিল ১২ জুলাইয়ের ঘটনা। বেলা স্কুল থেকে ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরছিল। সে দেখল, তাদের বাড়ি আর অন্য হিন্দুদের বাড়ির সামনে মানুষের জটলা। তাদের সবাই ছিল সশস্ত্র। হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দিচ্ছে তারা আর বাড়িঘর থেকে নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সবাইকে রাস্তায় বের করে এনে হত্যা করছে। 'আল্লাহু আকবর' স্লোগানও দিচ্ছিল তারা। বেলা চোখের সামনে তার বাবা-মাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন হতে দেখেছে। তার চোখের সামনে তার বাবা-মা মারা গেছেন। বর্বর মুসলমানরা তার মায়ের স্তন শরীর থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই স্তন থেকে একজন মা—হিন্দু হোক, মুসলমান, ইহুদি অথবা খ্রিষ্টান হোক, নিজের শিশুকে দুধ পান করিয়েছে।

মানুষের জীবনে মায়ের বুকের দুধ সৃষ্টির বিশাল সীমারেখার সম্প্রসারণে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। আর সেই দুধেলা স্তনকে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে কেটে ফেলা হচ্ছে। কোনো মানুষ কি আরেকজন মানুষের সঙ্গে এ রকমের নিষ্ঠুর আচরণ করেছে? কোনো নিষ্ঠুর পাপী হয়তো তাদের মনে এ রকমের কালো কালির ছাপ মেরে দিয়েছে। আমি কোরআন পড়েছি এবং আমি জানি যে, বেলার মা-বাবার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা ইসলামে নেই আর তা মানবতাও নয়। তা শত্রুতার মতোও কিছু ছিল না, ছিল না প্রতিশোধ গ্রহণের মতোও কিছু। সেটা ছিল এমন এক নিষ্ঠুর কাপুরুষতা আর শয়তানি অপকর্ম, যা অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে, আর আলোর শেষ রশ্মিটুকুও অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে।

বেলা এখন আমার কাছে আছে। এর আগে সে মুখে দাড়ি আছে, এমন একজন মুসলমান দালালের কাছে ছিল। তারও আগে ছিল দিল্লির এক মুসলমান দালালের কাছে। বেলার বয়স বারো বছরের বেশি নয়। তখন সে ক্লাস ফোরে পড়ত। এখন বাড়িতে থাকলে উঠত ক্লাস ফাইভে। তার বাবা-মা এখন তাকে একটি মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিত। আর তার ছেলেপিলে হতো। ছোট্ট সুখের সংসার নিয়ে জীবন কাটাত। সংসারের খুঁটিনাটি আনন্দ-বেদনায় তার দিন কাটত। কিন্তু নরম ফুলের কলি শুকিয়ে গেল অসময়ে। বেলার বারো বছর বয়স তেমন কিছু নয়। কিন্তু তার সামনে পড়ে আছে বিস্তৃত জীবন। তার চোখে-মুখে যে ভীতির ছাপ, মানবতা সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা বা

তার রক্তাক্ত ছবি, মৃত্যুর ক্ষুধা, কায়েদে আজম সাহেব আপনি ওকে দেখলে সহজে সেটা অনুমান করতে পারতেন। আপনি যদি সেই আশ্রয়হীন মেয়ের দৃষ্টির গভীরে চোখ মেলে তাকাতেন, অবশ্য আপনি তো ভদ্রলোক মানুষ! আপনি ভদ্র পরিবারের নিষ্পাপ মেয়েদের নিশ্চয়ই দেখেছেন। হিন্দু হোক বা মুসলমান, কিশোরীরা কত নিষ্পাপ হয়ে থাকে! তারা সমগ্র মানবতার আমানত, তাদের কোনো ধর্ম নেই। তাদের যারা নিশ্চিহ্ন করতে চায়, তাদের কোনো ধর্মের খোদাই ক্ষমা করবেন না।

বতুল ও বেলা দুজনেই সহোদর বোনের মতো আমার বাড়িতে থাকে। আসলে ওরা সহোদর বোন নয়। বতুল মুসলমান মেয়ে আর বেলার জন্ম হিন্দু পরিবারে। এখন ওরা বোম্বাইয়ের ফারেস রোডে একজন পতিতার ঘরে। বেলার বাড়ি রাওয়ালপিন্ডি আর বতুল জলন্ধরের খেমখরন গ্রামের এক পাঠান পরিবারের মেয়ে। বতুলরা ছিল সাত ভাইবোন। তিন বোনের বিয়ে হয়েছে আর চার বোনের হয়নি। বতুলের বাবা ছিলেন খেমখরনের একজন মামুলি কৃষক। গরিব পাঠান। তারা সেখানে বসবাস করছে কয়েক শ বছর ধরে। বেশিরভাগ অধিবাসী জাট। মাত্র তিন-চারটি পরিবার ছিল পাঠান। পণ্ডিতজি আপনি বুঝতে পারবেন যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের গ্রামে মসজিদ তৈরি করার অনুমতি ছিল না। বাড়িতে বসেই তারা চুপচাপ নামাজ আদায় করত। যখন মহারাজ রণজিৎ সিং পাঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন থেকে কোনো মুসলমানের পক্ষে গ্রামে আজান দেওয়া সম্ভব হয়নি। মনের ভেতরে অনেক আকুতি-মিনতি ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা কোনো দিন টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

বতুল ছিল পরিবারের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। সাত বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ছিল সবারই প্রিয় আর খুবই সুন্দরী। মনে হয়, তার গাঁ ছুলে যেন ময়লা লেগে যাবে। পণ্ডিতজি আপনি কাশ্মীরি বংশজাত। শিল্পীর কদর বোঝেন, আর এও জানেন যে, রূপসী কাকে বলে। এই রূপসী আজ আমার নোংরা পরিবেশের স্তূপে পড়ে আছে, তাকে পরখ করার জন্য কোনো ভদ্রলোক পাওয়া যাবে না। আমার এই নোংরা আড্ডায় ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারি, গোঁফধারী ঠিকাদার, আর নাপাক চাহনির চোরাকারবারিদের আনাগোনা। বতুল নিরক্ষর। সে শুধু জিন্নাহ সাহেবের নাম শুনেছে। পাকিস্তানকে একটা বড় ধরনের তামাশা মনে করে স্লোগান দেয়, যেমন করে অবুঝ চার-পাঁচ বছরের শিশু বাড়িতে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে থাকে। ওর বয়স তো মাত্র এগার বছর।

অশিক্ষিত বতুল মাত্র দিন কয়েক হলো আমার বাড়িতে এসেছে। একজন হিন্দু দালাল আমার কাছে তাকে পাঁচ শ টাকায় বিক্রি করে গেছে। সে আগে কোথায় ছিল আমি জানি না। তবে লেডি ডাক্তারের কাছে যে কাহিনি শুনেছি, আপনি তা শুনলে আপনারও পাগল হবার উপক্রম হবে। বতুলেরও এখন আধপাগল অবস্থা। জাটেরা তার বাবাকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করেছে যে, সে কথা শুনলে ছয়

হাজার বছরের পুরোনো হিন্দু সভ্যতার পিঠের চামড়া ছিঁড়ে যাবে। মানুষের সেই বর্বরতা প্রকাশ্যে সবার সামনে ঘটেছে। প্রথমে জাটেরা তার দুই চোখ উপড়ে ফেলে। তারপর ধর্ষণ করে তার বিবাহিত মেয়েদের। তাদের বাবার লাশের সামনেই রেহানা, গুলদরখসান, মর্জিনা, সুশান ও বেগমকে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষণ করা হয় মন্দিরের মূর্তির সামনেই। অথচ এই মূর্তিকে তারা কত সম্মান করত, পূজা করত, প্রণাম করত। এসব মূর্তির সামনেই মা-বোন ও বউদের ইজ্জত নষ্ট করল বর্বর লোকগুলো। এই দৃশ্য দেখে মন্দিরের পবিত্র মূর্তিগুলো পর্যন্ত লজ্জা পেয়েছে। হিন্দু ধর্মের মান-ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সহনশীলতাকে পর্যন্ত তারা ধ্বংস করে ফেলেছে। এবার নিজেদের মান-সম্মানকেও ধ্বংস করে ফেলল তারা। আজ মন্দির থেকে উচ্চারিত হচ্ছে না কোনো মন্ত্রতন্ত্র। সব নীরব-নিস্তব্ধ। গ্রন্থ সাহেবের প্রতিটি ছত্র লজ্জা পেয়েছে। গীতার প্রতিটি শ্লোক আহত। এমন কেউ কি আছেন, যিনি আমার সামনে অজন্তার ধ্রুপদ শিল্পকর্মের গুণগান করতে পারবেন? অশোকের সুনাম করতে পারবেন? বতুলের নিষ্পাপ ঠোঁট আর বাহুতে পশুদের আঁচড়ের চিহ্ন। তার হেলেদুলে চলাফেরায় অজন্তার শিল্প-সুষমার যে রূপ ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে। তোমাদের ইলোরার জানাজা আর তোমাদের সভ্যতাকে কাফন পরানো হয়েছে। একবার আসুন, আপনাকে আমি বতুলের রূপ সৌন্দর্য দেখাতে চাই যা এখন নেই, এখন সে জীবন্ত লাশ।

আবেগের বশে আমি অনেক কিছু বলে ফেলেছি। অবশ্য এসব কথা আমার বলা উচিত ছিল না। সম্ভবত এ পর্যন্ত কেউ আপনাদের এমন বেমানান কথাবার্তা বলেনি বা শোনায়নি। আপনারা কখনোই এমন অপকর্ম করতে পারেন না। তবুও আমাদের দেশে স্বাধীনতা এসেছে, স্বাধীনতা এসেছে ভারতে ও পাকিস্তানে। সম্ভবত একজন পতিতারও এ রকমের প্রশ্ন করার অধিকার অবশ্যই আছে?

বেলা ও বতুল দুজনই কিশোরী, দুজনেরই ধর্ম ভিন্ন। তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি ভিন্ন, মসজিদ ও মন্দির ভিন্ন। বেলা ও বতুল এখন ফারেস রোডের একজন পতিতার বাড়িতে। চীনা সেলুনের পাশের গলিতে তার বাড়ি। এই বাড়িতে চলে পতিতাদের ধান্ধা। বেলা ও বতুলের এই পেশা পছন্দ নয়। আমি তাদের কিনে নিয়েছি। আমি তাদের পতিতাবৃত্তির পেশায় নিয়োজিত করতে পারি। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই কাজ আমি তাদের দিয়ে করাব না। আমি তাদের ফারেস রোডে পতিতাদের যে জগৎ, সেই জগৎ থেকে তাদেরকে আগলে রেখেছি। তবুও যখন আমার গাহকরা পেছনের কামরায় হাত-মুখ ধুতে যায়, তখন বেলা ও বকুলের দিকে তাদের চোখ চলে যায়। বেলা ও বতুলের চাহনি যেন আমাকে কিছু বলতে চায়। আমি তাদের কোনোভাবে আশ্বস্ত করতে পারিনি। আপনারা ওদের চোখের ভাষা বুঝে নিতে পারেন না? পণ্ডিতজি, আমি চাই, আপনি বতুলকে

আপনার কন্যা হিসেবে গ্রহণ করুন। জিন্নাহ সাহেব, আমার দাবি, আপনি বেলাকে দত্তক কন্যা হিসেবে নিয়ে নিন। অনুগ্রহ করে এদের দুজনকে আপনারা ফারেস রোডের পতিতালয়ের অন্ধকার গলি থেকে উদ্ধার করুন, আর নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে আপনাদের হেফাজতে রাখুন। আর সেই সব নির্যাতিত মানুষের বেদনাভরা শোকগাথা শুনুন, যার ধ্বনি নোয়াখালী থেকে রাওয়ালপিন্ডি পর্যন্ত এবং ভরতপুর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত গুঞ্জরিত হচ্ছে। গভর্নমেন্ট হাউসে বসে কি এই আওয়াজ আপনারা শুনতে পান না? এই আওয়াজ একদিন অবশ্যই শুনতে পাবেন।

ইতি আপনার বিশ্বস্ত
ফারেস রোডের একজন পতিতা

পেশোয়ার এক্সপ্রেস

আমি যখন পেশোয়ার স্টেশন ছেড়েছি, তখন আনন্দে স্বস্তির একরাশ নিঃশ্বাস নিয়েছি। আমার ট্রেনের বগিতে ছিল বেশিরভাগই হিন্দু শরণার্থী। তারা এসেছিল সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার থেকে, মর্দান থেকে, কোহাট, চরসদ্দা, খাইবার, লান্ডিকোটাল, নওশেরা ও মানশেরা থেকে। পাকিস্তানে জানমালের নিরাপত্তা নেই। তাই ওরা ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে। স্টেশনটা ছিল খুবই সুরক্ষিত এবং সেনাবাহিনীর অফিসাররাও ছিলেন খুবই সজাগ ও সতর্ক। তবে, যতক্ষণ আমি (যাদের পাকিস্তানে 'মোহাজির' আর ভারতে 'শরণার্থী' বলা হয়) পঞ্চনদীর দেশের দিকে পাড়ি জমাইনি, ততক্ষণ তারা অস্বস্তিতেই ছিল। অন্য পাঁচজন পাঠান থেকে এই সব শরণার্থীকে পার্থক্য করা যাচ্ছিল না। তারা বেশ দীর্ঘদেহী আর সুদর্শন, পরনে লুঙ্গি ও কুর্তা, হাত-পায়ের গড়ন বেশ শক্তপোক্ত, অনেকের পরনে সালোয়ার। তাদের ভাষা পশতু। অনেক সময় কর্কশ পাঞ্জাবি ভাষাতেও তারা কথা বলে। প্রত্যেক বগির পাহারায় দুজন করে সৈন্য। তারা হিন্দু-পাঠান এবং তাদের বউ-বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে তারা মুচকি মুচকি হাসছিল। তাদের হাতে আধুনিক রাইফেল। ভয়ে-আতঙ্কে এইসব পরিবার তাদের পুরোনো বসতবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। এখানে তারা হাজার বছর ধরে বসবাস করেছে। এখানকার পাহাড়ি জমি তাদের শক্তি-সাহস জুগিয়েছে, তার তুষার-ঝরনা তাদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে এবং এই ভূমির রোদ-ঝলমল বাগান থেকে তোলা মিষ্টি আঙুরের স্বাদ ভরিয়ে দিয়েছে তাদের প্রাণ। হঠাৎ একদিন এই দেশ-গ্রাম তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাড়ি জমাল এক নতুন দেশের ঠিকানায়। তাদের জানমাল ও মেয়েদের ইজ্জত বাঁচিয়ে কোনোরকমে যে তারা চলে আসতে পেরেছে, সে জন্য ভগবানের কাছে তারা কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখ ও রাগে তাদের হৃদয় থেকে যেন রক্ত ঝরছিল। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে তাদের বুকে যেন 'গ্রেনেড' বিদ্ধ হচ্ছিল আর অভিযোগ করছিল, 'মা গো, কেন এভাবে নিজের সন্তানদের তাড়িয়ে

দিচ্ছ? তোমার বুকের উষ্ণ আশ্রয় থেকে কেন মেয়েদের বঞ্চিত করলে? এসব নিরপরাধ কুমারী মেয়ে তোমার শরীরে আঙুরলতার মতো জড়িয়ে ছিল এত দিন। কেন হঠাৎ তাদের টেনেহিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেললে, মা গো মা!'

উপত্যকার মাঝখান দিয়ে আমি দ্রুত ছুটছিলাম আর আমার কামরাগুলোর ভেতর থেকে এই শরণার্থীদের দল বিষণ্ন চোখ মেলে দেখছিল পেছনে ফেলে আসা মালভূমি, ছোট বড় উপত্যকা আর ঝিরঝির করে বয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা ছোট নদী। চোখের পানিতে যেন শেষবারের মতো সবাইকে বিদায় জানাচ্ছে। প্রান্তরের প্রতি অণু ইঞ্চির দিকে ওদের চোখ। বিদায়বেলায় সবকিছু যেন বুকের গভীরে গেঁথে নিয়ে যেতে চায়। আমারও মনে হলো, চাকাগুলো বোধহয় ভারী হয়ে উঠেছে। দুঃখ-বেদনায় যেন আটকে যাচ্ছে ওরা, আর চলার শক্তি নেই। এবার বোধহয় থেমে পড়বে।

হাসান আবদাল স্টেশনে আরও একদল শরণার্থী উঠল। এরা শিখ, পাঞ্জা সাহেব থেকে এসেছে, সঙ্গে লম্বা কৃপাণ, মুখে ভীতির চিহ্ন। ডাগর ডাগর চোখের শিশুগুলো পর্যন্ত যেন অজানা ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। ওরা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার বগিতে ঢুকে পড়ল। একজন বাড়িঘর সব হারিয়েছে, আরেকজন শুধু পরনের কাপড় নিয়ে, অন্যজন পায়ের জুতো ছাড়াই পালিয়ে আসতে পেরেছে। এক কোনায় বসে থাকা লোকটিকে ভাগ্যবান বলতে হবে। কেননা, তিনি সঙ্গে সবকিছু নিয়ে আসতে পেরেছেন, এমনকি ভাঙা কাঠের তক্তপোশ পর্যন্ত। যারা সবকিছু হারিয়েছে তারা চুপচাপ বসে আছেন। আবার যে উদ্বাস্তু সারা জীবনে ইটের টুকরো পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেনি, তারা লাখ টাকা হারানোর গল্প শোনাচ্ছে আর উদ্ধার করছে নেড়েদের চৌদ্দগুষ্টি। ডিউটিরত বেলুচ সৈন্যরা নীরবে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

আমাকে তক্ষশীলা স্টেশনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। স্টেশনমাস্টার জানালেন, 'আশপাশের গ্রাম থেকে একদল হিন্দু শরণার্থী আসছে। তাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। আমার বগির লোকজন পালিয়ে আসার সময় সামান্য যা-কিছু খাবার আনতে পেরেছিল, পোঁটলা খুলে তা-ই খেতে শুরু করল। বাচ্চারা হইচই করছিল আর তরুণীরা জানালার বাইরে শান্ত গম্ভীর চোখে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ দূরে ঢোলের শব্দ শোনা গেল। যাত্রী হিন্দু শরণার্থীদের একটি দলকে ট্রেনের দিকে আসতে দেখা গেল। স্লোগান দিতে দিতে তারা এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দলটা স্টেশনের কাছে এসে গেল। এক ঝাঁক গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল, সঙ্গে ঢোলের আওয়াজ। তরুণী মেয়েরা ভয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এল। এই দলটি ছিল হিন্দু শরণার্থীদের দল, প্রতিবেশী মুসলমানদের আশ্রয়ে ছিল। প্রতিটি মুসলমানের কাঁধের ওপর ঝুলছে গ্রাম ছেড়ে যারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

করেছিল, তেমন সব কাফেরের লাশ। এ রকম দু শ মৃতদেহ স্টেশনে এনে বেলুচ সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। মুসলমান জনতার দাবি, মৃত এই হিন্দুদের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে ভারত পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। বেলুচ সৈন্যরা লাশগুলো বুঝে নিয়ে প্রত্যেক বগির ভেতরে মাঝ বরাবর ভাগে ভাগে রেখে দিল। এরপর মুসলমান জনতা আকাশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে গুলি ছুড়ল এবং স্টেশনমাস্টারকে ট্রেন ছাড়ার নির্দেশ দিল। আমি কেবলই চলতে শুরু করেছি, হঠাৎ একজন চেইন টেনে আমাকে থামিয়ে দিল। এরপর মুসলমান জনতার দলনেতা বললেন, এই দু শ শরণার্থী চলে যাওয়ায় তাদের গ্রাম শূন্য হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ট্রেন থেকে দু শ হিন্দু ও শিখ শরণার্থীকে নামিয়ে দিতে হবে। ওরা তাদের গ্রামে থাকবে। কারণ দু শ জনের শূন্যতা পূরণ করতে হবে। বেলুচ সৈন্যরা দেশপ্রেমের জন্য তাদের প্রশংসা করল এবং বিভিন্ন বগি থেকে দু শ শরণার্থীকে বেছে নিয়ে জনতার হাতে তুলে দিল।

'সব কাফের সরে দাঁড়াও,' তাদের নেতা হুঙ্কার দিল। এই নেতা পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন প্রভাবশালী জমিদার। শরণার্থীরা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তাদের এক সারি লোককে স্টেশনে দাঁড় করানো হলো। দু শ লোক যেন দু শ জীবন্ত মৃতদেহ। ভয়ে তাদের মুখগুলো সব নীল। চোখের তারা ছুটে বেরোচ্ছে যেন রক্তলোলুপ তীর...।

বেলুচ সৈন্যরাই গুলি শুরু করল। পনেরো জন শরণার্থী গুলি খেয়ে মরে পড়ে গেল। জায়গাটা ছিল তক্ষশীলা স্টেশন। আরও কুড়িজন পড়ে গেল।

এই তক্ষশীলায় ছিল এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে লাখ লাখ ছাত্র মানবসভ্যতা বিষয়ে তাদের প্রথম পাঠ নিয়েছিল।

স্টেশনের প্লাটফর্মে আরও পঞ্চাশজন মুখ থুবড়ে পড়ে মরল।

তক্ষশীলার জাদুঘরে ছিল সুন্দর সুন্দর মূর্তি। অলংকারের অতুলনীয় কারুকৃতি, দুর্লভ শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, আমাদের সভ্যতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল দীপশিখার মতো।

এবার আরও পঞ্চাশ জন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। এর পটভূমিতে ছিল সিরকপের রাজপ্রাসাদ, খেলাধুলার জন্য একটা বিরাট থিয়েটার হল আর পেছনে মাইল কয়েক জুড়ে এক গৌরবোজ্জ্বল ও মহান নগরের ধ্বংসাবশেষ। তক্ষশীলার অতীতের গৌরবের স্মৃতি হয়ে টিকে রয়েছে।

আরও তিরিশ জন মারা গেল। এখানে রাজত্ব করতেন কনিষ্ক। তাঁর রাজত্বে প্রজাদের ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি আর ভ্রাতৃত্ববোধ।

তারা আরও কুড়িজনকে মেরে ফেলল। এই গ্রামগুলোতেই একদিন বুদ্ধের মহান সংগীতের গুঞ্জন শোনা যেত। ভিক্ষুরা এখানে বসেই রচনা করেছিলেন প্রেম, সত্য আর সৌন্দর্যের বাণী। দেখেছিলেন নতুন ধরনের জীবনযাপনের স্বপ্ন।

এখন সেই দু শ জনের মধ্যে মাত্র শেষ কয়েক জন মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায়।

এখানে ভারতের সীমান্তে ইসলামের বাঁকা চাঁদ খচিত পতাকা উড়েছিল আর ঘোষণা করেছিল ভ্রাতৃত্ব, সাম্য আর মানবতার বাণী।

সবাই এখন লাশ। আল্লাহু আকবর। প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে এবং এত ঘটনার পর যখন আবার আমি রওনা দিলাম, আমার মনে হলো যে, আমার নিচের লোহার চাকাগুলো যেন পিছলে যাচ্ছে বারবার।

গাড়ির প্রতিটি বগিতেই মৃত্যুর হিম স্পর্শ। মাঝখানে শোয়ানো মৃতদেহগুলো আর চারপাশে জীবন্ত মৃতেরা বসে আছে ট্রেনের সিটে সিটে। কোথাও একটা বাচ্চা কেঁদে উঠছে। এক কোনায় মা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। স্বামীর মৃতদেহ আঁকড়ে ছিল একজন মহিলা। আমি ছুটতে লাগলাম ভয়ে। এইভাবে এসে পৌঁছালাম রাওয়ালপিন্ডি স্টেশনে।

এখানে আমাদের জন্য প্রতীক্ষায় ছিল না কোনো শরণার্থী। কেবল পনেরো-বিশজন পর্দানশিন মেয়েলোককে সঙ্গে নিয়ে কয়েক জন মুসলমান যুবক আমার একটি বগির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওদের সঙ্গে ছিল রাইফেল, সঙ্গে কয়েক বাক্স গোলাবারুদ। তারা আমাকে ঝিলাম আর গুজরখাঁর মধ্যবর্তী জায়গায় থামিয়ে নামতে লাগল। হঠাৎ সঙ্গে আসা পর্দানশিন মেয়েগুলো বোরকার পর্দা তুলে চিৎকার করতে শুরু করল, 'আমরা শিখ, আমরা হিন্দু, ওরা জোর করে আমাদের নিয়ে এসেছে।' যুবকেরা হেসে উঠল, 'তারা তো আমাদের লুটের মাল। ওদের তো ঘর থেকে জোর করেই এনেছি। যেভাবে ইচ্ছা আমরা ব্যবহার করব। কে বাধা দেবে?'

দুজন হিন্দু পাঠান ওদের উদ্ধারের জন্য ঝাঁপ দিতেই বেলুচ সৈন্যরা ওদের শেষ করে দিল। আরও পনেরো-বিশ জন যুবক একইভাবে চেষ্টা করল। তারাও মিনিট কয়েকের মধ্যে খতম হয়ে গেল। তারপর ওই তরুণী মেয়েদের টানতে টানতে কাছের এক বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি কালো ধোঁয়ায় মুখ আড়াল করে সেখান থেকে ছুটে চললাম সামনের দিকে। আমার লোহার ইঞ্জিনের হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে, আর আমার বুকের লাল গনগনে আগুনের শিখা যেন গিলে খাবে এই ঘন জঙ্গলকে, পুড়িয়ে ছাই করে দেবে তাদেরকে, যারা গ্রাস করেছিল পনেরো জন মেয়েকে।

লালামুসা স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই মৃতদেহের দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়ল। বেলুচ সৈন্যরা সিদ্ধান্ত নিল, লাশগুলোকে ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলা হবে। যেসব যাত্রীকে দেখতে তাদের ভালো লাগে না, এমন একজনকে নির্দেশ দেওয়া হবে মৃতদেহগুলো ট্রেনের দরজার কাছে নিয়ে আসতে, তারপর তাকে এবং মৃতদেহগুলোকে একসঙ্গে বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। এর ফলে যাত্রী কমতে থাকে এবং পা ছড়িয়ে বসার জায়গাও হয়।

লালামুসা থেকে এসেছি আমি ওয়াজিরাবাদ। পাঞ্জাবের অত্যন্ত পরিচিত শহর এটা। সারা ভারতে এখান থেকেই ছুরি রপ্তানি করা হয়। আর এই ছোরা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরকে হত্যা করে। ওয়াজিরাবাদে হয়ে থাকে বিখ্যাত বৈশাখী উৎসব। হিন্দু-মুসলমানরা এখানে সমবেত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উৎসব পালন করে থাকে। আমি যখন ওয়াজিরাবাদে পৌঁছাই, দেখি, চারদিকে শুধু ছড়ানো-ছিটানো মৃতদেহ। অনেক দূরে শহরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, আর স্টেশনের কাছে কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি, অট্টহাসি আর উন্মত্ত জনতার করতালি। মনে হলো বৈশাখী উৎসব।

জনতা প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে এল, সঙ্গে একদল উলঙ্গ মেয়েলোক। তাদের ঘিরে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে তারা এল। মেয়েলোকগুলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাদের মধ্যে বৃদ্ধা ও তরুণী, ছিল বাচ্চাকাচ্চারা, নগ্নতা নিয়ে যাদের কোনো ভয়-ভাবনা নেই। তাদেরকে ঘিরে ঘিরে পুরুষপুঙ্গবেরা নাচছে-গাইছে। মেয়েদের সবাই হিন্দু শিখ আর পুরুষগুলো মুসলমান। তিন সম্প্রদায় মিলেই যেন বৈশাখী উৎসবে মেতেছে। মেয়েরা হেঁটে চলেছে। তাদের চুল আলুথালু। দেহ অনাবৃত হলেও তারা মাথা উঁচু করেই হেঁটে চলেছে, যেন হাজারো শাড়িতে তাদের শরীর ঢাকা। চোখে কোনো ঘৃণার লেশমাত্র নেই। লাখো সীতার অকলঙ্কিত অহংকার যেন তাদের দুচোখের লাভায় জ্বলজ্বল করছে। হয়তো এই লাভার মুখ বন্ধ, তবে এখনই যেন বিস্ফোরিত হবে। আর এই আগুন পৃথিবীকে পুড়িয়ে দোজখে পরিণত করবে।

তাদের চারদিকে জনতার স্লোগান, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জিন্দাবাদ'।

বিচিত্র এই শোভাযাত্রা সরাসরি গাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ান। এই দৃশ্য দেখে ট্রেনের শরণার্থী মেয়েরা আঁচলে মুখ লুকোয় আর ট্রেনের জানালাগুলো দ্রুত বন্ধ হতে থাকে।

বেলুচ সৈন্যরা গর্জে ওঠে, 'জানালা বন্ধ করবে না, তাজা হাওয়া ঢুকতে দাও।' কিন্তু যাত্রীরা সৈন্যদের কথা গ্রাহ্য না করায় তারা গুলি চালাল। কয়েক জন শরণার্থী মারা গেল। তবুও জানালা বন্ধ করা থামেনি, ট্রেনের বগির একটি কামরার জানালাও খোলা ছিল না।

এই উলঙ্গ স্ত্রীলোকদের ট্রেনে উঠে শরণার্থীদের মধ্যে বসে পড়তে বলা হলো। তারপর তারা 'ইসলাম জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'; 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে আমাকে বিদায় জানাল।

গাড়িতে বসা একটি বাচ্চা একজন নগ্ন বৃদ্ধাকে বলল, 'মা, তুমি কি এখুনি গোসল করে এসেছ ?'

'হ্যাঁ বাবা, আমার দেশের ছেলেরা আর আমার ভাইয়েরা আমাকে গোসল করিয়েছে।'

'তাহলে কাপড়চোপড় কোথায়?'

'বাবা, আমার বৈধব্যের রক্তে ওই কাপড়ে দাগ লেগেছিল। তাই আমার ভাইয়েরা সেই কাপড়চোপড় নিয়ে গেছে।'

আমি যখন ছুটছি, তখন দুই উলঙ্গ তরুণী আমার গাড়ির দরজা দিয়ে বাইরে লাফ দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করল। ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠি আর লাহোর পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

লাহোর একনম্বর প্লাটফর্মে এসে থামলাম। আমার উল্টো দিকে দুই নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল অমৃতসর থেকে আসা একটি ট্রেন। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে ট্রেনটি মুসলমান শরণার্থীদের নিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকরা আমার গাড়ির সবগুলো বগিতে তল্লাশি চালাল। টাকাপয়সা, গয়নাগাটি ও মূল্যবান মালামাল যা পেল, সবকিছু কেড়ে নিয়ে গেল। তারপর তারা চার শ শরণার্থীকে বেছে নিল। কামরা থেকে তাদেরকে একে একে বের করে নিয়ে গেল তারা। দাঁড় করানো হলো লাইন করে। যেন তারা কোরবানির খাসি। ব্যাপারটা হয়েছে কি, মুসলমান শরণার্থীদের বহন করা যে ট্রেনটা অমৃতসর থেকে আসছিল, পথে তার গতিরোধ করে খুন করা হয় চারশ মুসলমানকে। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের সম্প্রদায়ের পঞ্চাশজন স্ত্রীলোককে। কাজেই এখন পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে সমতা রক্ষা করার জন্য চারশ হিন্দু ও শিখ শরণার্থীকে হত্যা করা হলো এবং পঞ্চাশজন হিন্দু ও শিখ মেয়েলোককে একইভাবে নিয়ে যাওয়া হলো।

মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকরা ছোরা হাতে পর্যায়ক্রমে এক এক করে কয়েক মিনিটের মধ্যে চার শ শরণার্থীকে হত্যা করল। তারপর আমি এগিয়ে যাই। আমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণার আগুন। আমার সমস্ত শরীর খুবই অপবিত্র হয়ে গেছে। মনে হয় শয়তান আমাকে জাহান্নাম থেকে ধাক্কা দিয়ে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দিয়েছে। পৌঁছে দেখি পরিবেশ পাল্টে গেছে।

মোগলপুরায় সৈন্যদের বদল করা হলো। তাদের জায়গায় এবার এল শিখ ও ডোগরা সেনা সদস্যরা। আতারি স্টেশন থেকে পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে গেল। হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা অসংখ্য মুসলমান শরণার্থীর মৃতদেহ দেখতে পেল। ফলে খুশিতে তারা আত্মহারা। বুঝতে পারল স্বাধীন ভারতের সীমান্তে এসে গেছে তারা।

অমৃতসর স্টেশনে পৌঁছে দেখি, শিখরা স্লোগানে স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখর করে তুলতে ব্যস্ত। এখানেও মুসলমানদের লাশের স্তূপ এবং হিন্দু, রাজপুত আর ডোগরারা ট্রেনের প্রতিটি কামরায় উঁকি মেরে জিগ্যেস করছে, 'কোনো শিকার আছে কি?' অর্থাৎ কোনো মুসলমান আছে কি না।

অমৃতসর থেকে চারজন ব্রাহ্মণ আমার গাড়িতে উঠল। তারা হরিদ্বারে যাচ্ছে। তাদের মাথা ন্যাড়া, কপালে তিলক। রাম নাম ছাপা ধুতি পরে তারা তীর্থে যাচ্ছে।

অমৃতসর থেকে বন্দুক, বর্শা ও কৃপাণ হাতে দলে দলে হিন্দু শিখরা পূর্ব পাঞ্জাব অভিমুখী ট্রেনে উঠে বসল। তারা শিকারের খোঁজে ঘুরছে। তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণদের দেখে তাদের সন্দেহ হলো। জিগ্যেস করল, 'ব্রাহ্মণ দেবতা, তা যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'হরিদ্বারে।'

'হরিদ্বারে, না পাকিস্তানে,' একজন ইয়ার্কি করে বলল। একজন ব্রাহ্মণের মুখ ফসকে বের হলো, 'আল্লাহ আল্লাহ করো।'

'তাহলে খতম করা হোক,' সে হাঁক দিল, 'নাথা সিং, নাথা সিং, এদিকে এসো, বড় শিকার পাওয়া গেছে।'

ওরা একজনকে বল্লম দিয়ে খুন করল। অন্য তিনজন ব্রাহ্মণ পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের ধরে ফেলল। নাথা সিং চিৎকার করে বলল, 'হরিদ্বারে যাওয়ার আগে তোমাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করা জরুরি।' ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গেল, ওদের 'খতনা' করা হয়েছে।

তারপর ওই তিনজন ব্রাহ্মণকেও হত্যা করা হলো। তারা প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করেছিল।

হঠাৎ একটা ঘন বনের ধারে আমাকে থামানো হলো। থামার পর হঠাৎ করেই আমার কানে আছড়ে পড়ল 'সৎশ্রী আকাল হর হর মহাদেব' স্লোগান আর দেখলাম পাহারায় থাকা সেনাসদস্য, শিখ, জাট ও হিন্দু শরণার্থীরা ট্রেন ছেড়ে জঙ্গলের দিকে পালাচ্ছে। ভাবলাম, ওরা হয়তো মুসলমানদের ভয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু ধারণাটা আমার ভুল। ওরা যাচ্ছে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য নয় বরং কয়েক শ গরিব মুসলমান চাষিকে হত্যা করার জন্য। এইসব মুসলমান চাষি তাদের বউ, ছেলেমেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। আধঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। বিজয়ীর বেশে সবাই ফিরে এল। একজন জাট বর্শার ডগায় একজন মুসলমান শিশুর মৃতদেহ শূন্যে দোলাতে দোলাতে গান গাইছিল, 'দেখো, বৈশাখী জটা এনেছি।'

জলন্ধরের কাছে পাঠানদের একটা গ্রাম ছিল। এখানে আসার পর আবার আমাকে চেইন টেনে থামানো হলো। সবাই নেমে আবার ছুটল ওই গ্রামটার দিকে। পাঠানরা তাদেরকে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল; কিন্তু আক্রমণকারীরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। অস্ত্রশস্ত্রে ছিল সজ্জিত। প্রতিরোধ করতে গিয়ে গ্রামের পুরুষদের জীবন দিতে হলো। এবার মেয়েদের পালা। এখানে বিস্তীর্ণ খোলা মাঠের পাশে গাছের নিচে তাদের ইজ্জত হরণ করা হলো। এই হলো পাঞ্জাবের সেই মাঠ, যেখানে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ চাষিরা মিলেমিশে সোনার ফসল ফলাত। সেখানে সরষের সবুজ পাতায় ও হলুদ ফুলের সমারোহ পুরোটা গ্রাম এক স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হতো। এই সব পিপুল, শীষম ও সারিন

গাছের ছায়ায় সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর স্বামীরা অপেক্ষা করত কখন তাদের প্রিয়তমা স্ত্রীরা খাবার নিয়ে আসবে। ওই যে মাঠের ধারের আল দিয়ে ওদের সার বেঁধে আসতে দেখা যাচ্ছে। হাতের কলসির মধ্যে লসসি, আর মধু, গমের চাপাতি আর মাখন। তৃষ্ণাতুর চোখে কৃষকেরা চেয়ে থাকত কিষানি বধূর দিকে, তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বউদের বুক কেঁপে কেঁপে উঠত। এটাই পাঞ্জাবের হৃদয়। এখানেই জন্ম নিয়েছিল সোনি আর মাহিওয়াল, হির ও রাঞ্ঝা। আর এখন পঞ্চাশ জন নেকড়ে, পঞ্চাশ জন সোনি আর পাঁচ শ মাহিওয়াল। এই পৃথিবী আর কখনো আগের মতো হবে না। চেনাব নদী আর কখনো ঝিরঝির করে বয়ে যাবে না। হির, রাঞ্ঝা আর সোনি-মাহিওয়াল এবং মির্জা সাহেবানদের গানের সুর কখনো হৃদয়ে ঠিক আগের মতো গুঞ্জন তুলবে না।

লাখো অভিশাপ নেমে আসুক এই সব নেতা, আর তাদের সাতপুরুষের মাথায়, যারা এই সুন্দর মর্যাদামণ্ডিত ভূখণ্ডকে অসম্মান ও হত্যার লীলাক্ষেত্র বানিয়েছে, যারা তার শরীরে হত্যা, লুটতরাজ ও ধর্ষণের বীজ বপন করেছে। পাঞ্জাব আজ মৃত। তার সংস্কৃতির মৃত্যু হয়েছে। তার ভাষার মৃত্যু হয়েছে। মৃত তার সংগীত। আমার যদিও চোখ-কান কিছুই নেই, তবুও আমি এই মৃত্যুর দৃশ্য দেখলাম, শুনতে পেলাম মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের কাতরধ্বনি।

শরণার্থী ও সৈন্যরা পাঠান নারী-পুরুষদের মৃতদেহগুলো বহন করে স্টেশনে ফিরে এল। আবার কয়েক মাইল যাওয়ার পর একটা খাল পাওয়া গেল। এখানে আমাকে থামানো হলো। লাশগুলো জড়ো করে এখানে ফেলে দেওয়া হলো। তারপর আবার আমার এগিয়ে যাওয়ার পালা। রক্ত ও ঘৃণার স্বাদ তারা পেয়েছে এবং এখন দেশি মদের বোতল খুলে তারা আনন্দ-ফুর্তি করতে মেতে উঠল। আমি রক্ত, মদ আর ঘৃণার ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে যেতে থাকি।

আবার আমি লুধিয়ানায় এসে থামলাম। এখানে লুটেরারা শহরে ঢুকে মুসলমান মহল্লা আর সেখানকার দোকানে দোকানে হামলা চালালো। ঘণ্টা দুয়েক বাদে দশ-বিশ জন মুসলমানকে হত্যা করার পর তারা স্টেশনে ফিরে এল। চলার পথে পথে চলতে থাকে তাদের হত্যাযজ্ঞ। যতক্ষণ পর্যন্ত শরণার্থীরা ঘৃণাকে বিদায় না জানায়, আমার এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল খুবই দুষ্কর। এতক্ষণে আমার বুকে অনেক ক্ষত জমেছে এবং আমার কাঠের শরীরে খুনিদের রক্তের দাগে এত ময়লা জমে যায় যে, আমার গোসলের দরকার কিন্তু আমি জানি, চলার পথে আমাকে এ সুযোগ দেওয়া হবে না।

অনেক রাতে আম্বালায় পৌছালাম। এখানে একজন মুসলমান ডেপুটি কমিশনার, তাঁর বউ ও বাচ্চাদের সেনাবাহিনীর পাহারায় আমার গাড়ির প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় তুলে দেওয়া হলো। এই মুসলমান সরকারি কর্মকর্তার জীবন ও সম্পত্তির যেন কোনো রকম ক্ষতি না হয়, সৈন্যদের সে ব্যাপারে কঠোর

নির্দেশ দেওয়া হলো। রাত দুটোয় আম্বালা ছেড়ে আসি। মাইল দশেকও যাইনি, এমন সময় চেইন টানা হলো। মুসলমান কর্মকর্তা প্রথম শ্রেণীর যে কামরায় চেপে যাচ্ছিলেন, তার দরজা বন্ধ। কাজেই তারা জানালার কাচ ভেঙে কামরায় ঢুকে ওই মুসলমান ডেপুটি কমিশনার, তাঁর বউ আর তিনটি শিশুকে হত্যা করল। ডেপুটি কমিশনারের একটি অল্প বয়সী মেয়ে ছিল। খুবই সুন্দরী। তাই তারা তাকে খুন করেনি। তারা মেয়েটি, গয়নাগাটি ও ক্যাশবাক্স নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। মেয়েটির হাতে ছিল একটা বই।

জঙ্গলে গিয়ে তারা সলাপরামর্শে বসল। মেয়েটিকে কী করা হবে? তারা ওকে হত্যা করবে, নাকি বাঁচিয়ে রাখবে, এই নিয়ে পরামর্শ।

মেয়েটি বলল, 'আমাকে খুন করার দরকার নেই। আমি তোমাদের ধর্মে দীক্ষা নেব এবং তোমাদের একজনকে বিয়ে করব।'

'মেয়েটি তো ঠিক কথাই বলেছে,' একজন তরুণ বলল। 'আমার মনে হয় ওকে আমাদের...।' আর একজন তরুণ তাকে বাধা দিয়ে মেয়েটির পেটে একটা ছোরা বসিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার মনে হয়, ওকে এখানেই খতম করা উচিত। এসব বৈঠকটৈঠক করে লাভ নেই। চলো, ট্রেনে ফিরে যাই।'

মেয়েটি ওদের হাতে নিহত হলো। জঙ্গলের শুকনো ঘাসের ওপর মেয়েটি ছটফট করতে করতে মারা গেল। আর তার হাতের বইখানা রঞ্জিত হলো তারই দেহের রক্তে। বইটা ছিল সমাজতন্ত্র নিয়ে লেখা। মেয়েটা ছিল হয়তো খুবই বুদ্ধিমতী। বড় হয়ে হয়তো দেশ ও জাতির সেবা করত। হয়তো সে কাউকে ভালোবাসত। ভালোবাসা পাওয়ার জন্য উন্মুখ ছিল, উদগ্রীব ছিল প্রেমিকের আলিঙ্গনের জন্য, নিজের সন্তানকে চুমো দেওয়ার জন্য। সে তো নারী ছিল। হতো কারও প্রিয়তমা অথবা জননী। আর এখন সে এই জঙ্গলে পড়ে আছে লাশ হয়ে। শকুন আর শেয়ালেরা তার লাশ ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। সমাজতন্ত্র নিয়ে লেখা বইটা জানোয়ারেরা ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। বিপ্লবের দরজা আর কেউ খুলছে না। কেউ কিছু বলছে না।

হতাশ রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। দেশি মদ খেয়ে মাতাল কিছু লোক বসে আছে আমার বগির কামরায়। ওরা স্লোগান দিচ্ছে 'মহাত্মা গান্ধীর জয়' বলে।

বোম্বাই এসেছি অনেক দিন পর। এখানে ওরা আমাকে ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে শেডের মধ্যে রেখে দেয়। আমার শরীরে এখন আর রক্তের দাগ নেই। খুনিদের হৈহুল্লোড় আর স্লোগান নেই। কিন্তু রাতে যখন একলা থাকি, মৃত আত্মারা যেন ভূতের রূপ ধরে আবার জেগে ওঠে। আহত শরণার্থীরা জোরে চিৎকার করে ওঠে, ভয়ে ককিয়ে ওঠে নারী আর শিশুরা। আর আমি অনুক্ষণ কামনা করি, আমাকে যেন এ রকমের ভয়ানক যাত্রায় কেউ না নিয়ে যায়। এ ধরনের ভয়াবহ

যাত্রার জন্য আমি এই শেড ছাড়তে রাজি নই। কিন্তু আমি ঠিকই সুন্দর যাত্রার জন্য প্রস্তুত, সে যাত্রা হবে দীর্ঘ গ্রাম-গঞ্জের ভেতর দিয়ে, যখন পাঞ্জাবের মাঠ সোনালি ফসলে আবার ভরে উঠবে। তখন সরষে ফুলের খেত দেখে মনে হবে হির রাঞ্ঝার অমর প্রেমের গান গাইছে। তখন হিন্দু, মুসলমান শিখ—সবাই এক সঙ্গে মিলেমিশে মাঠে মাঠে চাষাবাদের কাজ করবে, বীজ বুনবে, ঘরে ফসল তুলবে আর প্রেমে ও পূজায় এবং নারীর প্রতি সম্মান জানাতে তাদের হৃদয় ভালোবাসা ও প্রেমে আবার কানায় কানায় ভরে উঠবে।

আমি সামান্য কাঠের তৈরি একটা প্রাণহীন ট্রেন। কেউ প্রতিশোধ ও ঘৃণার এমন জঘন্য ভারী বোঝা আমার পিঠে চাপিয়ে দিক, আমি তা চাই না। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে আমাকে দিয়ে খাদ্য বহন করানো হোক, আমাকে দিয়ে গ্রামে চাষিদের জন্য ট্রাক্টর আর সার বহন করে নিয়ে যাওয়া হোক। আমাকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে যেন না নেওয়া হয়।

আমি চাই, আমার গাড়ির প্রতিটি বগিতে সুখী চাষি ও শ্রমিকের দল এবং তাদের স্ত্রীদের কোলে থাকবে পদ্মফুলের মতো সুন্দর সব শিশু। ওরা মৃত্যুকে নয়, বরং আগামী দিনের জীবনকে মাথা নত করে কুর্নিশ করবে। এই সব শিশুই এক নতুন জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যেখানে মানুষ হিন্দু ও মুসলমান হিসেবে পরিচিত হবে না, শুধু পরিচিত হবে একমাত্র মানুষ হিসেবে।

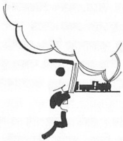

জ্যাকসন

রাতটা ছিল পূর্ণিমার। প্রচণ্ড শীত। ঠান্ডায় রাস্তাঘাট পর্যন্ত শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। আর জ্যাকসনের ভারী জুতোর পদক্ষেপও ছিল শক্ত আর ভারী। আর সড়কের দুপাশের গাছগুলোও পুলিশের প্রহরীর মতো শক্ত সটান দাঁড়িয়ে। তেমনি এই আকাশের নিচে সবকিছুই যেন দাঁড়িয়ে আছে অনড়ভাবে। উদাহরণ হিসেবে জ্যাকসনের কথা বলা যায়। তিনি লাহোর শহরের ডেপুটি পুলিশ সুপার। যে সড়ক দিয়ে তিনি যাচ্ছেন, তাকে ইমপ্রেস রোড বলা হয়। জ্যাকসনকে আমি পেছন থেকে অনুসরণ করছি, যেন কেউ তার ওপর হামলা চালাতে না পারে। তার পকেটে একটি পিস্তলও আছে। এ দেশে তিনি বিশ বছর চাকরি করেছেন। ১৯৪৭ সালের পনেরো আগস্ট আসার মাত্র চার দিন বাকি। ভারত ওই তারিখে স্বাধীন হবে এবং জ্যাকসনের রাজত্বেরও শেষ সেদিন থেকেই।

জ্যাকসন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। তার পরও নিজেকে তিনি ইংরেজ মনে করেন। তাই ইংরেজদের রাজত্বের অবসান ঘটতে যাওয়ায় তার মনে বিস্তর দুঃখ। বিশ বছর ধরে তিনি দাপটের সঙ্গে ভারতকে শাসন করেছেন। ব্রিটিশদের দু শ বছরের রাজত্বে বিশটা বছর তার জীবনের একটা মূল্যবান অংশ। তিনি পাঞ্জাবের সব জেলায় কাজ করেছেন এবং সেসব জায়গায় তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে বাংলো আর আটজন চাকর। তার শাসনাধীনে ছিল বিশটি থানা, হাবিলদার, ইন্সপেক্টর, সেপাই আর হাজারো ভারতবাসী। বলা চলে বিশ বছর পর্যন্ত তিনি এ দেশে রাজত্ব করেছেন। আসছে পনেরো আগস্ট শেষ হবে তার সেই রাজত্বের। পায়ের জুতোর নিচে পেরেক অথবা রাতের কালো চাদরে ঢাকা আকাশের তারার মতোই বিষয়টা তার মনে গেঁথে আছে। আজ সবকিছুই তার কাছে কঠোর এবং স্থির মনে হচ্ছে। ভারত তার দেশ নয়। তার মনে বারবার এ কথাটা বেজে চলেছে যে, তিনি ভারতীয় নন, একজন ইংরেজ এবং তাকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হবে। তাই তিনি ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারে একটা বাড়ি এবং একটা দুধের খামার কিনেছেন।

এখন থেকে দুই বছর পর পেনশনের টাকাপয়সা নিয়ে ইয়র্কশায়ারে চলে যাবেন তিনি। সঙ্গে যাবে তার স্ত্রী ও মেয়েরা। কোনো ঝুট-ঝামেলা নেই, বিপদ-আপদ নেই। তার বড় মেয়ের নাম সিনথিয়া আর ছোটটির নাম রোজি। দুজনেই যেন জলসাঘরের সাজসজ্জার মতো। কয়েক জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবক বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু মেয়েরা তাদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা খাঁটি ইংরেজকে বিয়ে করতে চায়, তাও অভিজাত বংশের কাউকে। তারা ঠিক সেইসব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ের মতো নয়, যারা সারাক্ষণ ছেলেদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। তাদের চিন্তাধারা বাবার মতো শক্ত ও সুদৃঢ়। আর এ কথাটা পুলিশ সুপার সাহেব ভালোভাবেই জানতেন। জ্যাকসন মেয়েদের তার রাজত্বের চাইতে বেশি ভালোবাসতেন। বিশেষত তার ছোট মেয়ে রোজিকে তিনি ভালোবাসতেন প্রাণের চাইতেও বেশি।

রোজি ছিল অপূর্ব সুন্দরী। ইংল্যান্ডের যেকোনো লর্ডকে বিয়ে করার যোগ্য। নাচের প্রতিযোগিতায় সে সব সময় প্রথম হতো। সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও মনোনীত হতো শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসেবে। পড়াশোনাতেও সে ছিল মেধাবী। ক্লাসে সব সময় সে প্রথম হতো। সংগীতে, পিয়ানো বাজানোয়, ছবি আঁকায়, মোটরগাড়ি চালানোতেও দক্ষ ছিল সে। সিনথিয়াও ব্যক্তিগত গুণের বিচারে ছোট বোন রোজির চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তবে তার গায়ের রং ছিল বাদামি। তার পরও একটা বিষয়ে সিনথিয়াও পিছিয়ে ছিল না। আর তা হলো, ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা। রোজি ভারতীয়দের দারুণ ঘৃণা করত, যেমন সে ঘৃণা করত মাছ খেতে। বাইবেলে যেমন শয়তানের কাহিনির বর্ণনা আছে, তেমনি বাবা-মার কাছ থেকে ভারতীয়দের সম্পর্কে শুনেছে বিস্তর গল্প। এসব গল্প তাদের কাছে আলিফ লায়লার কাহিনির মতো রহস্যময় মনে হয়েছে। শুনেছে ভারতীয় ডাকাতদের কাহিনি, জাটদের রক্তপাত ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মেয়েদের অপহরণ, পকেটমার, চুরিচামারি আর তাদের অবৈধ মদ খাওয়ার গল্প। শুনেছে ভারতীয় অফিসাররা উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে এবং ভারতীয় মুনাফাখোর ব্যবসায়ী শেঠরা লিপ্ত চোরাকারবারে। এসব কিছুই রোজির কাছে আশ্চর্য মনে হয়। ফলে তার তৎপরতা টেনিস খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এসব জায়গায় চেহারাসুরত সুন্দর, এমন সব ছেলেমেয়েরাই আড্ডা দিয়ে থাকে।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাতে সারবদ্ধ গাছের ছায়ায় বসে বাহুলগ্না বান্ধবীদের গালে-ঠোঁটে চুমু দিয়ে চলেছে প্রেমিক যুবকেরা। এক শ্বাসরুদ্ধকর দশা তাদের। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাতেই এ ধরনের দৃশ্য স্বাভাবিক। মনে হয় সুন্দরী যুবতীদের সবাই নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে। আর তাদের মুখে অপরূপ মিষ্টি হাসি। পরমুহূর্তেই তারা তিতির পাখির মতো আকাশে উড়ে যায়। তবে তাদের সুবাস আকাশে-বাতাসে তখনো ভেসে বেড়াচ্ছে। মস্তিষ্কের কোষে কোষেও যেন এখনো চলছে তাদের সাঁতার।

এ জীবন ভারতীয়দের জীবন থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। ঘৃণা করা সত্ত্বেও অনেক সময় কোনো ভারতীয় যুবক বা তরুণের সঙ্গে রোজি কথা বলতে চায়। অবশ্য তেমন কারো সঙ্গে আলাপ হলেও তারা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান জীবনাচারের অন্ধ-অনুসারী। অবশ্য রোজি তেমন-কিছু পছন্দ করে না। বরং ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতার পর রোজির খুবই খারাপ লেগেছে। কারণ, ভারতীয়দের কেউ আজ পর্যন্ত ভালো করে 'হ্যালো' পর্যন্ত বলতে শেখেনি। আর সিনথিয়া তো এ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় পুরুষের সঙ্গে নাচার চেষ্টাই করেনি। কোনো ভারতীয় বন্ধুর বন্ধু যাতে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে না পারে—এ ব্যাপারে সে ভয়ানক সতর্ক। সে যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, সে ব্যাপারেও সে ছিল পুরোপুরি সচেতন। তার গায়ের রং ছিল শ্যামলা। ইউরোপীয়রা তাদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানই মনে করে।

তখন তিনি নিজের পবিত্র অ্যাংলো-স্যাক্সন রক্তে ভারতীয় রক্ত মিশ্রিত হওয়ার জন্য নিজেকে গালমন্দ করে আর বলে, 'এই অসভ্য হিন্দুস্তানিরা সব জিনিসে ভেজাল দেয়। দুধে, চিনিতে, ঘিয়ে, কাপড়ে আর ফসলে—সবকিছুতেই। এমনকি সিনথিয়ার রক্তেও তারা বাজে রক্ত মিশিয়ে দিয়েছে। শালার শুয়োরের!'

জ্যাকসন তার মেয়েদের ভালো শিক্ষা দিয়েছেন এবং বাজে পরিবেশের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যেন ইংল্যান্ডের জন্য তারা নিরাপদ থাকে। যেমন—অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী কাজেও অর্থাৎ ইংল্যান্ডের স্বার্থ যেকোনো পরিস্থিতিতেই যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সে নীতিই তিনি অনুসরণ করে থাকেন। আর সেটা ফিলিস্তিনি ম্যান্ডেটের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তার মগজের নামফলকে মোটা মোটা অক্ষরে তার দুই মেয়ের ব্যাপারে লেখা ছিল 'রিজার্ভড ফর ইংল্যান্ড'।

যখনই তিনি মেয়েদের নিয়ে কথা বলে অথবা তাদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তখন নামফলকের ওই লেখাগুলো তার কল্পনায় ভেসে ওঠে। রাতের অন্ধকারে যেমন করে ইলেকট্রিকের থামে পেট্রোল পাম্প ক্যালটেক্সের বিজ্ঞাপন একবার জ্বলে আর নেভে, ঠিক তেমনি করে জ্বলে আর নেভে 'রিজার্ভড ফর ইংল্যান্ড,' 'রিজার্ভড ফর ইংল্যান্ড' কথাগুলো। আসলে জ্যাকসন তার দুই মেয়ে আর ইয়র্কশায়ারের সুন্দর বাড়ির ব্যাপারে পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন তিনি ইমপ্রেস রোড থেকে ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছেন।

কনকনে ঠান্ডা বাতাস। পথঘাট জনমানবশূন্য। পেটে ছয় পেগ মদ পড়েছে। ফলে জ্যাকসনের পা দুটো ভারী হয়ে উঠেছে। তার চোখ-মুখ, মন, আর চোখের চাহনিতে মদের প্রবল প্রভাব। হাঁটতে হাঁটতে তার পা থেমে যায়।

এখানে মেয়েদের কলেজ। একজন খ্রিষ্টান শিক্ষিকার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভাবলেন, সেপাইদের নিয়ে তিনি কলেজের আশপাশে কোথাও চলে যাবেন। ওই শিক্ষিকার বাসার কড়া নেড়ে তাকে জাগিয়ে তুলবেন। হঠাৎ কী মনে করে মুচকি হেসে ভাবলেন, ভুল হয়ে গেছে। তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। তিনি আবার এগিয়ে

যেতে থাকেন। সামনের মোড় পার হয়ে, অল ইন্ডিয়া রেডিও ভবন ছাড়িয়ে তার বাড়ির কাছে পৌঁছে যান। গেটে ডিউটিরত সেপাইরা তাকে স্যালুট দিয়ে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার গেটে ফিরে যায়। জ্যাকসন বাড়ির ভেতরে ঢোকার পর বেয়ারা চুপি চুপি বলল, 'উনি এসেছেন হুজুর।'

'কোথায় বসেছেন?'

বেয়ারা ইশারা করে বলল, 'নেহালচন্দ্র খোকরকে সরকারি অফিসে বসানো হয়েছে আর মওলানা আল্লাদাদ পিরজাদাকে ড্রইংরুমে। হুজুর, ওদের পান করতে কিছু দেব?'

জ্যাকসন বলল, 'পিরজাদা সাহেবকে এক-দুই পেগ দাও। আমি আগে নেহালচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ সেরে নিই।'

নেহালচন্দ্র খোকর লাহোরের হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রভাবশালী নেতা। গরিব হিন্দুদের কল্যাণ করাই তার ধর্ম। তিনটি দৈনিক পত্রিকা, চার-চারটি বাড়ি আর গুজরানওয়ালায় দশ হাজার একর জমির মালিক। তার বড় ছেলে কংগ্রেস দলের এমএলএ। তার মেয়ের জামাই হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারি। তিনি নিজে সমাজতন্ত্রের বিরোধী। তাই তিনি একান্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য চারটি বাড়ি নিজের দখলে রেখেছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে বিপদে পড়েছেন। কারণ মুসলমানদের মধ্যে তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না। এ ছাড়া কোনো অজুহাতেই তিনি ইসলামধর্মে দীক্ষা নিতে পারছেন না। আসলে তার চিন্তাভাবনাতেই ছিল না যে, স্বাধীনতা পেতে গিয়ে পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হতে পারে, আর লাহোর শহর ভারতের দখল থেকে চলে যাবে পাকিস্তানের দখলে। না হলে তিনি কবেই খাজা হাসান নিজামির মুরিদ হয়ে যেতেন। না হয় আজমির শরিফে গিয়ে আধা মুসলমান হয়ে পড়ে থাকতেন।

এখন আর সে উপায় নেই। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিকে ভয়াবহ বোমা বর্ষণ, হত্যা আর লুটপাট চলছে। এখন কোথাও আশ্রয় নেওয়ার কোনো উপায় নেই। জ্যাকসনের সঙ্গে তার পুরোনো পরিচয়। সেই সুবাদেই আলাপ করতে এসেছেন।

'নেহালচন্দ্র সাহেব বললেন, 'আমার চিঠি তাহলে নিশ্চয়ই পেয়েছেন?'

জ্যাকসন বললেন, 'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'এখন বলুন, হিন্দুদের জীবন বিপন্ন, তাদের জন্য কী করা যায়!'

'শাহ আলমি দরওয়াজা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কৃষ্ণনগর, সন্তনগর, আর্যনগরের হিন্দুরা যদি লাহোর থেকে নিরাপদে বের হয়ে যেতে না পারে, তাহলে এক হপ্তার মধ্যে তাদের সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ডিএভি কলেজে তিন হাজার হিন্দু শরণার্থী আছে। তারা সরকারি রেশনের ওপর নির্ভরশীল।'

জ্যাকসন বললেন, 'ভারত সরকার তাদের জন্য কী করেছে?'

'সরকার একদিন বিমান থেকে ডিএভি কলেজ প্রাঙ্গণে রুটি ছুড়ে ফেলেছিল। রুটির সঙ্গে চিরকুট ছিল, আমরা আপনাদের এখান থেকে দ্রুত উদ্ধারের চেষ্টা

করছি। কিন্তু পরিস্থিতি এখন খারাপ। জানা গেছে, তাদের উদ্ধার করতে পনেরো শ ট্রাকের ব্যবস্থা করতে হবে। অপেক্ষা করতে করতেই আমাদের সবাই মারা পড়বে,' নেহালচন্দ্র বললেন।

জ্যাকসন মুচকি হাসেন, 'সরকার ঘুমিয়ে আছে, জানে না কলকাতা ডিপোতে হাজারো ট্রাক পড়ে আছে। দিল্লি, ফিরোজপুর, লুধিয়ানা—যেকোনো একটি শহরের ট্রাকগুলো রিকুইজিশন করলেই প্রয়োজনীয় ট্রাকের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা কিছুই করবে না।'

'তাহলে আমরা কোথায় যাব! এখানকার আশ্রয়কেন্দ্রে দোজখের যন্ত্রণা। ভগবানের দোহাই, জ্যাকসন সাহেব, এখন আমাদের সাহায্য করুন। সবার জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলেও অন্তত আমার পরিবারকে এই ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করে অন্য কোথাও সরানোর ব্যবস্থা করুন। আমার পরিবার বলতে আমি, আমার স্ত্রী, দুই ছেলে, মেয়ের জামাই, মেয়ে এবং একটি কুকুর। বিমানে অথবা সামরিক ট্রাকে করে চলে যাব। বাকি লোকজনকে ট্রেনে, গাড়িতে অথবা হাঁটাপথে যেভাবে হোক, অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন। সবার আগে আমাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করুন,' নেহালচন্দ্র বললেন।

জ্যাকসন বললেন, 'আপনি কত টাকা খরচ করতে পারবেন?'

একটুক্ষণ চিন্তাভাবনা করার পর নেহালচন্দ্রকে জ্যাকসন বললেন, 'আপনি আপাতত আমার কাছে বিশ হাজার রুপি রেখে যান। মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক নেতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তার সঙ্গে আলাপ করলে একটা সমাধান বের করা যাবেই। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা, আপনারা পালাচ্ছেন কেন? হারামজাদা মুসলমানদের সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে পারেন না?'

'কী যে বলেন আপনি? মোকাবিলা হাত দিয়ে করা যায় নাকি! ওদের কাছে মেশিনগান, রাইফেল আর ছুরি আছে।'

জ্যাকসন তার চেয়ার নেহালচন্দ্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনাদের যদি এই সব অস্ত্র সরবরাহ করা যায়?' কথাটা বলেই তিনি নেহালচন্দ্রের দিকে মদের গ্লাস এগিয়ে দেন। এবার জ্যাকসন তার চেয়ার নেহালজির আরও কাছে এগিয়ে আনেন। কথাটা শুনে নেহালচন্দ্রের চেহারা রক্তিম আকার ধারণ করে। বলেন, 'সত্যিই বলছেন?'

জ্যাকসন বললেন, 'আমরা পুরোনো বন্ধু। আপনাকে বিপদে অবশ্যই সাহায্য করব। আসলে লাহোরের ওপর হিন্দুদের অধিকার রয়েছে। হিন্দুরাই গড়ে তুলেছে লাহোরকে। লাহোরের উদ্যান, সুরম্য প্রাসাদ, কলেজ, সিনেমা হল—সবই হিন্দুদের হাতে গড়া। তারাই লাহোরের মালিক। এখানে তাদেরই বসবাস করা উচিত। পুরুষের মতো সাহসের সঙ্গে লড়াই করুন নেহালচন্দ্রজি। আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনার ওখানে কতজন পুরুষ আছে?'

নেহালচন্দ্র মদের গ্লাস থেকে এক পেগ গলায় ঢেলে দিয়ে জবাব দিলেন, 'লাহোরে একজন মাত্র নেতা আছেন, যার ওপর সবার ভরসা আছে, তিনি হলেন নেহালচন্দ্র খোকর।'

'জিন্দাবাদ,' জ্যাকসন বললেন। এরপর ঘণ্টা বাজান। বেয়ারা হাজির হলে তার কানে চুপিচুপি কী যেন বললেন। কিছুক্ষণ পর বেয়ারা ফিরে এলে জ্যাকসনের আবারও তার কানে কানে কী যেন বলতেই সে বেরিয়ে যায়। জ্যাকসন বললেন, 'আপনি এখানে বসুন। এক-আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি টেলিফোন করে দিয়েছি। এখনই অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি একটা মিলিটারি ট্রাক আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে এক শ সৈন্য যাবে। তারা আপনার লোকজনদের ট্রেনিং দেবে। ঠিক আছে না?'

নেহালচন্দ্র উঠে দাঁড়ান। বললেন, 'ঈশ্বর আপনাকে এর প্রতিদান দেবে জ্যাকসন সাহেব।'

জ্যাকসন সাহেবও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার এক্ষুনি এক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আপনি এখানে বসুন। আর এক পেগ পান করুন। আজকে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। এখানকার অস্ত্রশস্ত্রের দাম আর ড্রাইভারের মজুরি—সব আপনার কাছ থেকে নেওয়া হবে।' নেহালচন্দ্র আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ। তবে আমার পরিবারকে অবশ্যই অমৃতসরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানকার বাদবাকি কাজ আমি নিজেই করব।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' জ্যাকসন জবাব দিলেন।

ড্রয়িংরুমে মওলানা আল্লাদাদ পিরজাদা এসেছেন। অপেক্ষা করছেন তার জন্যই।

'বলুন, মওলানা সাহেব, মনে হয় আরামেই আছেন,' জ্যাকসন বললেন।

'এসব কথা বাদ দিন জ্যাকসন সাহেব। ইদানীং পুলিশ নাকি বেশ মওজে আছে। লাহোরে প্রত্যেক পুলিশ নাকি প্রচুর সোনাদানা লুটপাট করেছে। তাই দিয়ে তাদের সাতপুরুষ আরাম-আয়েশে কাটাতে পারবে। পুলিশ সেপাইদের যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে আপনার বাংলো তো সোনার ইটের তৈরি হওয়া উচিত,' মওলানা আল্লাদাদ বললেন। জ্যাকসন মওলানার পিঠে চড় দিয়ে বললেন, 'এত হইচই কেন?'

'আসলে আমি তো সিআইডিতে কাজ করি হুজুর,' মওলানার জবাব।

'তাহলে বলুন, খবর কী?'

'শুনুন, মডেল টাউনে সবচেয়ে ধনী শিখ ও হিন্দুরা থাকে। ডোগরা সৈন্যরা কাউকে কাছ ঘেঁষতেই দেয়নি। তা ছাড়া তাদের কাছে পিস্তল আছে। কয়েক দিন আগে সার্কুলার রোডের মুসলমানদের একটি দল সেখানে হামলা করার জন্য গিয়েছিল। চল্লিশ জন লোক মারা গেছে। আমাদের কাছে অস্ত্র নেই। জানি না হিন্দুরা

বোমা, মেশিনগান, রাইফেল, পিস্তল—সবকিছু কোথা থেকে পায়! বেচারা গরিব মুসলমানদের শুধু ছুরি আর চাকু দিয়ে আক্রমণ চালাতে হয়,' মওলানা জানালেন।

'আমি অস্ত্র কোথা থেকে দেব? আপনিও কেমন কথা বলেন, আল্লাদাদ। টাকা ছাড়া অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া মুশকিল। আমার কাছে থাকলে অবশ্যই দিয়ে দিতাম। আমাকে হিন্দুস্তানে নয়, পাকিস্তানে থাকতে হবে। হিন্দু বেনিয়াদের ব্যাপারে আমার কোনো আকর্ষণ নেই। তা ছাড়া ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে তো আমাদের খ্রিষ্টধর্মের মিল আছে। খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের মিলন হতে পারে, কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গে কোনো দিন তারা একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে না।'

মওলানা মুচকি হেসে বলল, 'টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'কোথায়?'

'একজন মুসলমান জমিদারের কাছ থেকে ইসলামের নামে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এনেছি। আপনি তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করুন। আমরা মডেল টাউনে লুটপাট করতে চাই।'

ঘণ্টা বাজান জ্যাকসন। বেয়ারা এলে তার কানে কানে কী যেন বললেন তিনি। সেটা শুনে সে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বেয়ারা জ্যাকসনকে কানে কানে কিছু একটা জানায়। তারপর আগের মতোই চলে যায় সেখান থেকে।

জ্যাকসন পঞ্চাশ হাজার টাকার নোটের বান্ডিল হাতে নিয়ে বললেন, 'এই টাকা আমার ড্রাইভারের হাতে দিয়ে দিন। আমি এক ট্রাক অস্ত্রের ব্যবস্থা করেছি, আধঘণ্টার মধ্যে এখানে এসে পৌঁছাবে। সেই ট্রাক নিয়ে চলে যান, ভবিষ্যতে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। ওরা অনেক বেশি টাকা দাবি করেছিল, অনেক কষ্টে আমি এই অল্প টাকায় এক ট্রাক অস্ত্রের ব্যবস্থা করেছি। তাদের বলেছি, গরিব মুসলমানরা এত টাকা কোথায় পাবে? আমি মুসলমানদের এত উপকার করেছি, অথচ আমাকে আপনারা পুলিশ সুপার পদে প্রমোশন দিতে পারলেন না। অকৃতজ্ঞ কোথাকার!'

পিরজাদা দ্বিতীয় পেগ মদ মুখে ঢেলে বললেন, 'বেশ ভালো মদ।'

'পুরোনো ফরাসি মদ, লাহোর থেকে একজন মহারাজা আমাকে পাঠিয়েছেন,' জ্যাকসন জবাব দিলেন।

'মহারানি নিশ্চয় ফরাসি মদের মতো সুন্দরী হবেন।'

'আরে বাদ দিন তো,' জ্যাকসন হাসতে হাসতে বললেন। 'শুনেছি এখন নাকি রোজই নতুন নতুন কুমারী মেয়েকে আপনার কাছে পাঠানো হয়।'

পিরজাদা মওলানা আল্লাদাদ মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'সব ওপরওয়ালারই মর্জি।'

কথাটা বলেই মদভর্তি গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে ধরেন তিনি। বিদ্যুতের আলোয় সেই মদ তরল সোনার মতো জ্বলজ্বল করছিল।

দুটি ট্রাক যখন দুই দিকে বিশ মিনিট অন্তর যাত্রা করে, তখন জ্যাকসন পায়ের বুট না খুলেই ড্রইংরুমে বসে পড়েন, আর দেয়ালে টাঙানো চার্টের দিকে তাকিয়ে জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে থাকেন। তার স্ত্রীর বয়স বেড়েছে, তাকে ইংল্যান্ডে নেবেন না; বরং তালাক দিয়ে তার হাতে মোটা অঙ্কের টাকা ধরিয়ে দিয়ে তাকে ভারতেই রেখে যাবেন। তার স্ত্রীর চেহারা-সুরত তার মেয়েদের মতো ফরসা না হলেও তার শরীর ও চেহারার বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে। তার পরও জ্যাকসন স্ত্রীকে ইউরোপীয় অভিজাত লোকজনের পার্টিতে কখনো নিয়ে যেতেন না। অবশ্য তিনি তার মেয়েদের দারুণ ভালোবাসেন। তাদের তিনি বিলেতে নিয়ে যাবেন আর সেখানে ভদ্র খাঁটি ইংরেজদের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। তার হাতে এখন প্রচুর টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি তার মেয়েদের জন্য অভিজাত ইংরেজ পরিবারের গরিব ছেলেদের কিনে নিতে সক্ষম। তিনি নিজেও একটি বিয়ে করবেন কোনো ইংরেজ সুন্দরী প্রিন্সেসকে। তিনি নিজেও তো সম্ভ্রান্ত সন্তান। নিশ্চয়ই তাদের বংশের পূর্বসূরি দু-একজনের ছবি ফেয়ার হলে ঝোলানো আছে। তাদের মাথায় শোভা পাচ্ছে মুক্তোখচিত মুকুট। তার বিয়ের ছবি ছাপা হবে *লন্ডন টাইমস*-এ। জ্যাকসন এসব ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন আর বেয়ারাকে জিগ্যেস করেন, 'ছোট মেম সাহেব বাসায় ফিরেছে কি?'

বেয়ারা জবাব দিল, 'বড় মেম সাহেবা আর সিনথিয়া ফিরেছেন। ছোট মেম সাহেবা সকালে ফিরবেন। নাচের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গেছেন। এই চিরকুটটা ছোট মেম সাহেবা রোজি আপনার জন্য রেখে গেছেন।'

জ্যাকসন মদের দ্বিতীয় পেগটা গলায় ঢেলে দিয়ে সোফায় বসে পড়েন, আর তার আদরের মেয়ের লেখা চিঠিটা পড়তে শুরু করেন। তাতে রোজি লিখেছে—

সুপ্রিয় ডার্লিং পাপা,

এটা তোমার প্রিয়তমা মেয়ে রোজির চিঠি। বার্ট ভবন থেকে লিখছি। এখানে আজ নাচের প্রতিযোগিতা চলছে। সিনথিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাচ্ছে আর আমি এখানে থেকে যাচ্ছি। কারণ, তুমি জানো, আমি প্রথম হব। তাই পুরস্কারটা হাতছাড়া করব কেন? কিন্তু পাপা, কেবল এ নিয়েই আমি তোমাকে চিঠি লিখছি না। আমার সামনে এখন সুন্দর পোশাক পরা অপূর্ব মনকাড়া সব দম্পতি। তারা রাজহাঁসের মতো নাচঘরের মেঝেতে সাঁতার কাটার মতো করে চক্কর দিতে ব্যস্ত। অপরূপ বাতির আলোতে অর্কেস্ট্রার সুর বাজছে। সৃষ্টি হয়েছে একটা মনোরম পরিবেশের। যেন চাঁদ আর সূর্য একসঙ্গে মিলেছে। আমাদের হৃদয়ের অন্দরে যেন প্রবেশ করেছে তাদের আলোকচ্ছটা। আমি অল্প একটু শেরি পান করেছি। তাই কবির মতো কাব্যচর্চা করছি। তবে আমি এই চিঠি শেরি পান অথবা নাচ সম্পর্কে লিখছি না। আমি আমার সঙ্গী সম্পর্কে তোমাকে জানানোর জন্যই লিখছি এই চিঠি। সে এখন আমার সামনে চেয়ারে বসে আছে আর আমার দিকে তাকিয়ে

মুচকি মুচকি হাসছে। তার নাম আনন্দ। সে একজন ভারতীয়। দুবছর ধরে তাকে আমি চিনি। পাপা, তুমি হয়তো চমকে উঠেছ, সম্ভবত রেগেও গেছ। কিন্তু আনন্দ আজেবাজে ছেলে নয়, যার ওপর তুমি রাগ করতে পারো। সে নাচঘরে এত ভালো নাচতে পারে যে, তার সঙ্গে কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অথবা ইংরেজ যুবকের তুলনাই চলে না। আনন্দের গায়ের রং শ্যামলা। আর তুমি জানো, আমার কাছে শ্যামলা রং পছন্দ নয়; বরং এই রংকে আমি ঘৃণাই করি।

প্রথম দিন যখন নাচের ঘরে আনন্দের সঙ্গে দেখা হয়, আমার সঙ্গে পরিচিত হয়, তখন আমি তার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় ছেলের মতো সে ভীত হয়নি। সে খারাপ মনে করেনি বরং হাসিমুখে এগিয়ে এসেছিল। তুমি জানো, পাপা, আমি হিন্দুস্তানি ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করি না। কিন্তু আনন্দের মুচকি হাসির ভাষা ভিন্ন রকমের। যখন সে আমাকে দেখে মুচকি হাসে, আমার মনে হয়, আমার হৃদয়ে একটা রঙিন প্রাসাদ গড়ে তুলেছে। আনন্দের মুচকি হাসি মারাত্মক। তার উচ্চতা ছয় ফুট। তার কোমর চিতাবাঘের মতো চিকন। তার চোখের রং কালো আর উজ্জ্বল। আর যখন সে কোমরে হাত রেখে নাচতে শুরু করে, তখন নাচের ঘরে যেন অন্ধকার নেমে আসে। কল্পনায় বাংলার জঙ্গলের ছবি ভেসে ওঠে, হাজারো গাছের চারা যেন নাচতে শুরু করে। আর গাছের সবুজ মসৃণ পাতাগুলো যেন চোখের ওপরে ঝুলতে থাকে। শোনা যেতে থাকে চিতাবাঘ, বাঘ, ভেড়া আর জংলি-জানোয়ারের আওয়াজ। আমার মনে হয়েছে, আমার বাড়ি বাংলাদেশের কোনো জঙ্গলে। আমি একজন শিকারির স্ত্রী। আর গাছের ছাল গায়ে জড়িয়ে যেন উপজাতীয় লোকজনের সঙ্গে জংলি নাচ নাচছি।

পাপা, তুমি আমার কথা সত্যি মনে করো, আনন্দের সঙ্গে নাচে প্রথম অংশ নিয়ে আমার এমনই অনুভূতি হয়েছে। এক বছর আগে আমার সঙ্গে তার পরিচয়। আমার সঙ্গে নিয়মিত দেখা করার জন্য সে উদ্গ্রীব থাকে। কিন্তু আমি একজন খাঁটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ের মতো তাকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছি। আনন্দ লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ছেলে। তার বাবা ধনী, গুজরানওয়ালার একজন বিত্তশালী লোক। আনন্দ দীর্ঘদিন বিলেতে ছিল। তার কাছে একটি পিকার্ড মোটরগাড়ি আছে। কয়েক জন ইংরেজ মেয়ে তার প্রেমে মশগুল, তাকে বিয়ে করতে তারা আগ্রহী। কিন্তু এসব খবরে আমি কান দিইনি, বরং এক বছর তার সঙ্গে আমি কোনো কথা বলিনি। এই এক বছর সে নাচের ঘরে আসতে থাকে আর আজেবাজে সব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও ক্রিশ্চিয়ান মেয়ের নাচের সঙ্গী হয়। প্রথম দিকে সে ভালো নাচতে জানত না। মাঝখানে তিন-চার মাস সে কোথায় যেন লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে ফিরে আসার পর দেখলাম সে খুব ভালো নাচতে জানে। একদিন বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে আমি নাচি। প্রথম নাচের প্রতিক্রিয়া

তোমাকে একটু আগেই জানিয়েছি। নাচের শেষে এখন আমরা টেবিলে পাশাপাশি বসে থাকি, যেন আমাকে কেউ জাদু করেছে।

আনন্দ আমার কাছে জিগ্যেস করে, আমি কেন হিন্দুস্তানিদের ঘৃণা করি?

উত্তরে আমি বলেছি, হিন্দুস্তানিদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়।

আনন্দ বলল, আমাকে শুঁকে দেখো, দুর্গন্ধ বের হয় কি না।

আমি তার দেহ শুঁকে দেখে বললাম, গন্ধ বের হয় ঠিকই, কিন্তু বিচিত্র ধরনের চিত্তাকর্ষক গন্ধ। আমাকে স্বীকার করতেই হলো।

আনন্দ আবার বলল, তুমি টমি ও অন্যান্য ইংরেজ ছেলের শরীর শুঁকে দেখো, এক শ ছেলের মধ্যে পঞ্চাশ জনের শরীরে দুর্গন্ধ পাবে। আর এক শ হিন্দুস্তানি যুবকের মধ্যে দুর্গন্ধ পাবে দশ জনের শরীরে।

আমি উত্তরে বললাম, তোমাদের মতো কালো আদমিদের দেহের দুর্গন্ধ এডিকোলন সেন্ট দিয়ে কি চেপে রাখা যায়? আনন্দ হাসতে থাকে। তার বাদামি রঙের চেহারায় তার সাদা দাঁত চমক দিচ্ছিল, যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। আমি ঘাবড়ে যাই। সে বলল, কেন?

আমি জবাব দিলাম, তোমার দাঁতগুলো সুন্দর।

আনন্দ উত্তর দিল, ভারতীয় দাঁত বাদামি রঙের মুখে চমক দেয় ভালো। সৌন্দর্যের একটি নয়, অনেকগুলো রং আছে। কয়েকটি রঙের মিশেলে রূপ-লাবণ্যের সৃষ্টি হয়।

আমি আবার বললাম, আমার পাপা বলেছে, তোমরা দারুণ ধোঁকাবাজ, জালিয়াত আর অবিশ্বস্ত। তোমাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ নেই।

আনন্দ উত্তর দিল, তোমার বাবা পুলিশ অফিসার। প্রতিনিয়ত যেসব হিন্দুস্তানিকে থানায় আনা-নেওয়া করা হয়, তাদের দেখেই তিনি আমাদের যাচাই করে থাকেন। আমি যদি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসার হতাম, তাহলে ইংরেজদের সম্পর্কে এমনই মন্তব্য করতাম। এবার শৃঙ্খলার প্রশ্নে আসা যাক। তুমি কি জানো না, দু-এক বছরের মধ্যে তোমরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে? কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের শৃঙ্খলা আর কঠোর নিয়ন্ত্রণ তোমরা দেখেছ।

রেগে আমি জবাব দিলাম, আমি জানি না। তারপর বললাম, তোমরা হিন্দুস্তানিরা শুয়োরের বাচ্চা। এ কথা বলার পর আমি টেবিল থেকে উঠে চলে আসছিলাম। আনন্দের মুখে হাসি। তখন সে বলল, আমি পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো অনেক কৌশল জানি। তোমাকে আমি পরাস্ত করবই।

তার এই চ্যালেঞ্জ আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু সম্ভবত হৃদয়ের একটি টুকরো তাকে পছন্দ করেছে। এরপর থেকে আমি তার সঙ্গে নিজের অজান্তে ভালো ব্যবহার করতে থাকি। বাইরে নয়, ভেতরে ভেতরে তাকে আমি নিজের সমকক্ষ বলে ভাবতে থাকি। যখনই আমাদের চার চোখের মিলন হয়, আমার দৃষ্টি প্রথমেই

সরিয়ে নিতে হয়। আগেই বলেছি, তার হাসি খুবই সংক্রামক। বুকে যেন কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়। শরীর অবশ হয়ে আসে, আর গলায় যেন ফাঁস পরিয়ে দেয়।

তারপর তিন-চার মাস কেটে গেছে। তার সঙ্গে কখনো নাচে অংশ নিইনি। এরপর এল নাচের প্রতিযোগিতার পালা। বাধ্য হয়ে পুরুষ সঙ্গী হিসেবে তাকে নির্বাচন করতে হলো। কারণ তার মতো ভালো নাচতে পারে, এমন সঙ্গী কাউকে পাওয়া গেল না। পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে আমরা দুজন একই গ্লাস থেকে মদ খাই। সে আমাকে চুমু দিতে পারত, কিন্তু তা করেনি। হেসে এড়িয়ে গেছে। তাতে করে মনে আমি শান্তি পেয়েছি। আমার মনে হয়েছে, সে আমাকে চুমো খাচ্ছে, আমাকে আদর করছে। তার শক্ত বাহুর কবল থেকে যেন নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছি না। আমি ভীত হয়ে তার টেবিল থেকে উঠে পড়ি, আর সে বোঝে না আমি কেন তার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। আবার সান্নিধ্যে আসছি। আমাদের দুজনের জাত আলাদা, দেশ আলাদা। ধর্ম, সংস্কৃতি—সবই ভিন্ন। কথাবার্তা, আহার-বিহার, চলাফেরা, ওঠাবসা—সবই আলাদা। কিন্তু তার সান্নিধ্য কেন আমার মনে যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি করে! এসব কথা ভেবে ভেবে আমার বিনিদ্র রাত কেটেছে। তুমি তোমার প্রিয়তম রোজির সিদ্ধান্ত এবং তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে যাতে জানতে পারো, এ সম্পর্কে যাতে গভীর চিন্তাভাবনা করতে পারো, সে কথা ভেবেই বিস্তারিতভাবে এই চিঠি লিখছি।

এখন আমি চুপি চুপি গোপনে তার সঙ্গে দেখা করি। কারণ নাচের ঘরে লোকজন তাকে রোজির ভারতীয় সঙ্গী বলে কথা চালাচালি করে থাকে, সিনথিয়া যা মোটেও পছন্দ করে না। আমি যদি আনন্দের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করি, আর মেলামেশা করি, তাহলে তোমার দুর্নাম হতো। লোকে বলত, ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট জ্যাকসনের মেয়ে একজন কালা হিন্দুস্তানির সঙ্গে প্রেম করছে। এ কথা আমার অসহ্য। তাই আমি গোপনে তার সঙ্গে দেখা করতাম। আমরা দুজন মেট্রোতে নাচতে যেতাম। সেখানে সমাগত সবাই ভারতীয়। অর্কেস্ট্রাও খুবই ভালো। অনেক ভারতীয় যুবকের সঙ্গে সেখানে আমার দেখা করার সুযোগ হয়েছে। এদের অনেকেই শিল্পী, লেখক, রাজনীতিবিদ, সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, আকালি সমর্থক, খদ্দর পোশাকধারী। তারা হিন্দুস্তানি মজদুর-কিষান, জাতি ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে, ইংরেজ রাজত্ব উল্টে দেওয়া আর সারা বিশ্বকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে নতুন মানবতার জন্ম দেওয়ার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন। অথচ বার্ট ইনস্টিটিউটে এ ধরনের আলোচনা হয় না। এসব আলোচনা আমি কখনো স্কুলে অথবা বাড়িতে শুনিনি, যা এ জগতে সুখ-দুঃখ আর খুশির সৃষ্টি করে, শুনিনি এমন সব কথা, যা শুনলে আমাদের কাজ করতে মন চায়। পাপা, এখন জেনেছি, তুমি ও তোমার জগৎ কতখানি পিছিয়ে আছে। আমি এই জাতি, তোমাকে, মা ও সিনথিয়াকে ভালোবাসি; কিন্তু তুমি এখন

মিসরের মমির মতো পুরোনো হয়ে গেছ, প্রিয় অথচ পুরোনো, ঠিক রোমান মূর্তির মতো সেগুলো জাদুঘরে শোভা পায়।

গত দুই বছরে আমি কী-কী করেছি, তা তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই। কারণ এসব কাজ আমি তুমি, মা ও সিনথিয়ার কাছ থেকে লুকিয়ে করেছি। আমি এই দুই বছরে ভারতকে ভালোবাসতে শিখেছি। আমি তাদের ভাষা শিখেছি, তাদের পোশাক পরেছি, তাদের খাবার খেয়েছি। আর ভারতীয় গান গেয়েছি, নাচে অংশ নিয়েছি। শাড়ি পরলে আমাকে অপূর্ব লাগে, যেন সারা দিন সেটা পরে থাকি। আমি কথাকলি আর ভরতনাট্যমের স্থায়ী আবেদনের প্রেমে পড়েছি। দু শ বছর ধরে আমাদের বিবেকে যে মরিচা ধরেছিল, তা পরিষ্কার হয়েছে। পাপা, আমি ভারতীয় মেয়ে। ভালোভাবে চেয়ে দেখো, আমার চেহারা পুরোপুরি ইংরেজদের মতো নয়। চেয়ে দেখলে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো ছাপচিত্র তোমার দৃষ্টিগোচর হবে, যেখানে আছ তুমি, সিনথিয়া এবং মা। ভালোভাবে চেয়ে দেখো, আমরা ভারতীয়।

আমি এই দুই বছরে ভারতকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। ভালোমন্দ মিশিয়ে এরা মানুষ—যেমন আমরা। পাপা, আমার কাছে জিলাপি, আমৃতি আর মোতিচুরের লাড্ডু খেতে ভালো লাগে। আর সালোয়ার-কামিজ আমার খুবই পছন্দসই। আর মোগলাই খাবারের কাছে আমাদের খাবার জংলি মনে হয়। কোরমা, শাম্মি কাবাব, মুরগ মুসল্লম আর জর্দা পোলাও—আরও কত কি! পাপা, তুমি ষোলোটি বছর বিশ্রী সুপ খাইয়ে খাইয়ে আমাদের খুন করেছ। এখনো বাসায় সুপ খেতে হয়। কিন্তু আনন্দের বাড়িতে আমাকে সুপ খেতে হবে না। তুমি *মেঘদূত*-এর তর্জমা পড়োনি, না-হলে হিন্দুদের বন্য বলতে না। আনন্দ আমাকে *মেঘদূত*-এর কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে, শেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব, গ্যয়টের দর্শন আর শেলির প্রেম—সবকিছু *মেঘদূত*-এ আছে। যে জাতি এমন কাব্যচর্চা করতে পারে, কবিতা লিখতে পারে, তাদের অসভ্য বলা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

পাপা, তুমি আমাকে ষোলো বছর পর্যন্ত ধোঁকা দিয়েছ। তুমি সারা জীবন নিজেকে ধোঁকা দিয়েছ। তুমি নিজের রক্ত থেকে ভারতীয় হিন্দিপনাকে পৃথক করতে চেষ্টা করেছ। তুমি এই জাতির ওপর রাজত্ব করেছ। অথচ তোমাদের উচিত ছিল এদের সেবা করা। তুমি হিন্দু আর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া ও লড়াই উসকে দিয়েছ। এখন তাদের অস্ত্র দিয়ে লড়াইয়ে উৎসাহিত করছ। অথচ তাদের ক্ষতস্থানে পট্টি লাগানো আর ওষুধ দেওয়া উচিত ছিল। আজ আমার চোখ খুলে গেছে, আমি তোমাদের জীবন থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি আনন্দের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। আনন্দের কাছে কিছুই নেই। তার বাড়িঘর লুট হয়েছে। তার পিকার্ড গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বাবা-মাকে হত্যা করা হয়েছে। তার পরনের শার্ট আর প্যান্ট ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু তার হৃদয় আছে। তার আত্মা তার কাছে আছে। আর সে প্রতিশোধ নেওয়ার আবেগে আপ্লুত

নয়। আমরা দুজন নতুন এক মানবতার বাণী শুনতে পেয়েছি, আর সেটা হলো এই মাটির পৃথিবীর বুকে স্বর্গ, যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদি, রুশ আর আমেরিকান—সবাই একই শিবিরে সমবেত হবে। তোমার ক্রীড়ানুরাগী মেয়ে সুতির শাড়ি পরে মোহাজির ক্যাম্পে যাচ্ছে। আমরা হিন্দুদের কাছে যাচ্ছি, মুসলমানদের কাছে যাব। সম্ভবত আমাদের কথা কেউ শুনবে না।

এভাবে আমাদের মৃত্যুও হতে পারে। হয়তো আমাদের জন্য এটা বোকামি, দারুণ ভুল হবে, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল কিছু হবে। কিন্তু জানি না, কে জানি বারবার একটি কথাই আমাকে বলছে, 'এটাই তোমার কর্তব্য। এভাবে তুমি পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারো। এভাবে তুমি দু শ বছরের লজ্জার দাগ ধুয়ে ফেলতে পারবে আর তোমার আত্মার প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরে পাবে। তুমি ভারতীয় মেয়ে, নাচঘরে নাচাই তোমার কাজ নয়, তোমার কাজ মানবতার সেবা করা।'

ইতি
রোজি

জ্যাকসন টলোমলো অবস্থায় উঠে দাঁড়ান। তার নেশা ছুটে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি আরও দুই পেগ মদ গলায় ঢেলে দিয়ে দ্রুত আয়নার সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি নিজের চেহারার দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকেন। ভাবতে থাকেন, আমি জ্যাকসন, রোজি আমার মেয়ে। এটা রোজির চিঠি। তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। হঠাৎ মনে হলো, তার চেহারায় ভারতীয় ছাপ ফুটে উঠেছে। নাক, চোখ, ঠোঁট, মাথা, কান—কিছুই ইংরেজদের নয়, সবই হিন্দুস্তানি। আমি ভারতীয়, না না আমি ইংরেজ। আমার বাড়ি ইয়র্কশায়ারে। আমার স্ত্রী একজন ইংরেজ প্রিন্সেস। তার মাথায় রোমান মুকুট। সে আমার জন্য ফেয়ার হলে অপেক্ষা করছে। তিনি দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরেন। কারণ তার চেহারায় অবিকল ভারতীয় অবয়ব ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে সেই ভারতীয় মস্তক, কালো চুল, ঠোঁট, কান, চোখ, ভ্রু—সবকিছুই ভারতীয়।

জ্যাকসন চিৎকার করে ওঠেন, আমি ভারতীয় নই, আমি ইংরেজ। খাঁটি ইংরেজ। ইয়র্কশায়ার, ডার্বি, নর্মান, নান্ট শাহ আর্থার।

আয়নার চারদিক থেকে ভারতীয় লোকজনের অট্টহাসি শোনা যাচ্ছে, হিন্দুস্তানি হিন্দুস্তানি অর্থাৎ ভারতীয়। চারদিকে হিন্দুস্তানি চেহারার লোকজন অট্টহাসি হাসতে হাসতে কাছে আসছে। ক্রমাগত তারা নিকটবর্তী হচ্ছে...।

জ্যাকসন পিস্তল হাতে নিয়ে মাথায় সোজা গুলি চালান। পর মুহূর্তে তিনি লুটিয়ে পড়েন মেঝেতে। তার কানের গোড়া থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত।

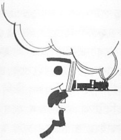

কিংবদন্তির উর্দু কথাশিল্পী কৃষণ চন্দর

কৃষণ চন্দর উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, কাহিনিকার ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক। উপমহাদেশে উর্দু সাহিত্যে তাঁর মতো খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা কম লেখকের ভাগ্যেই জুটেছে। জীবদ্দশাতেই তিনি উর্দু কথাসাহিত্যের প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। উর্দু ছোটগল্পকে তিনি এক নতুন মানে উন্নীত ও যোগ্যতর আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ভারত উপমহাদেশে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন। ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধী।

তাঁর জন্ম ১৯১৪ সালের ২৩ নভেম্বর পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা জেলার উজিরাবাদে। বাবা ছিলেন সরকারি ডাক্তার। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই ও এক বোন। সবাই তাঁর ছোট। ছোট ভাই মহীন্দ্রনাথও ছিলেন উর্দু গল্প লেখক। ১৯৪৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। বোন সরলা দেবীও উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের লেখিকা ছিলেন।

কৃষণ চন্দর লাহোর থেকে ইংরেজি ও ইতিহাসে বিএ, ইংরেজিতে এমএ পাস করার পর ১৯৩৭ সালে লাহোর ল কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। কলেজজীবন থেকে তিনি উর্দু ছোটগল্প রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে থাকেন। হিন্দি ও ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর কিছু রচনা রয়েছে। কলেজজীবনে সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং ট্রেড ইউনিয়নের সভায় অংশ নিতে থাকেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় প্রগতিশীল লেখক সংঘের যে সম্মেলন হয়েছিল, কৃষণ চন্দর তাতে যোগ দিয়েছিলেন। নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রগতিশীল লেখক সংঘের পাঞ্জাব শাখার সেক্রেটারি। তিনি একবার লাহোরে ঝাড়ুদার সংঘেরও সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি ভগৎ সিংয়ের দলে যোগ দেন। এ জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন এবং দুমাস জেলও খাটেন।

ফার্মন কলেজে পড়ার সময় তিনি কলেজের সাময়িকী সম্পাদনা করেন। শিক্ষাজীবন শেষে কয়েক মাস অধ্যাপক সনৎ সিংয়ের সঙ্গে *নর্দান রিভিউ* নামে

একটি পত্রিকা এবং ইংরেজ মহিলা ফরিদার সঙ্গে *দ্য মডার্ন গার্ল* নামে একটি ইংরেজি পত্রিকার প্রকাশনা ও পরিচালনাগত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৯ সালে কৃষণ চন্দর লাহোরে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম সহকারী হিসেবে চাকরি নেন। এর আগে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। পরে ডব্লিউ জেড আহমদের অনুরোধে শালিমার স্টুডিওতে কাহিনিকার ও সংলাপ রচয়িতা হিসেবে চাকরি নেন। তাঁর সংলাপ ও কাহিনিভিত্তিক প্রথম ছবি *মন কি জিত*। এরপর তিনি দিল্লি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেন। *মন কি জিত* ছবিটি অত্যন্ত সফল হলে তিনি দিল্লির অল ইন্ডিয়া রেডিওর চাকরি ছেড়ে দিয়ে বোম্বাইয়ে স্থায়ীভাবে চলে আসেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই ছিলেন।

ফিল্মের জন্য চিত্রনাট্য রচনা করা এবং গল্প লেখাকে তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন। তিনি নিজে *সরায়ে কে বাহর* (সরাইয়ের বাইরে) এবং *দিল কি আওয়াজ* (হৃদয়ের আওয়াজ) নামে দুটি ছবি প্রযোজনা ও নির্মাণ করেন। দুটি ছবিই ফ্লপ করে। তাই তিনি সিনেমা তৈরির বাসনা ছেড়ে দেন এবং গল্প ও উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করেন। পরে সাহিত্য রচনাই তাঁর জীবনের পেশা হয়ে ওঠে। সম্ভবত কৃষণ চন্দর সেই মুষ্টিমেয় উর্দু লেখকদের অন্যতম, যাঁরা কেবল সাহিত্য রচনা করে পাওয়া অর্থের ওপর নির্ভর করেই জীবন ধারণ করেছেন।

কৃষণ চন্দরের প্রথমা স্ত্রী দয়াবতী, দ্বিতীয় স্ত্রী বিশিষ্ট লেখিকা সালমা সিদ্দিকী। তাঁর তিন সন্তান। একটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে। শোনা যায়, নায়িকা উষা রানির সঙ্গে তাঁর রোমান্স ছিল, কিন্তু বিয়ে হয়নি।

প্রেম করতে গিয়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করলেও কেবল রোমান্টিক গল্প-রচনায় তিনি তার শক্তির অপচয় করেননি। তাঁর রচনার স্টাইল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃষণ চন্দর জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। জীবনকে তিনি হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে কাব্যময় করে তুলতেন—গল্পের প্লট ও চরিত্রগুলোকেও। তবে তাঁর গল্প কেবল রোমান্টিকতার বৃত্তে বদ্ধ ছিল না। আশপাশের জগৎ, মানুষ ও ঘটনাবলির চিত্রাঙ্কনে কৃষণ চন্দর ছিলেন অদ্বিতীয়। তাই তিনি রচনা করেছেন ১৯৪৪ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের ওপর বিখ্যাত নভেলেট *অন্নদাতা*, কালজয়ী গল্প *কালুভংগি* (কালু ঝাড়ুদার), *ডিনার*, *পেশোয়ার এক্সপ্রেস* প্রভৃতি। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। *গাধার আত্মকথা*, *গাধার প্রত্যাবর্তন*, *শয়তানের ইস্তেফা*, *কিতাবের কাফন* ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁর এজাতীয় রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারত বিভাগজনিত (১৯৪৭) দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা তাঁর গল্পগুলো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাতের নিদর্শন। দাঙ্গা-বিরোধী এসব গল্পেরই অন্যতম সংকলন *হ্যাম ওয়াহসি হ্যায়*। এই সংকলনের বিখ্যাত গল্প 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস'। সংকলনভুক্ত প্রতিটি গল্পে তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন।

কৃষণ চন্দরের রচিত ছোটগল্পের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক আর গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। চীনা ভাষাসহ আরও বেশ কয়েকটি বিদেশি ভাষার ওপর তাঁর ভালো

দখল ছিল। ৬৩ বছরের জীবনের প্রায় ৪০ বছরই তিনি সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্রের কাহিনি ও শিশুসাহিত্য—কোনো কিছুই তাঁর লেখনীবৃত্তের বাইরে ছিল না। বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর সর্বাধিকসংখ্যক ছোটগল্প ও উপন্যাস। রুশ ভাষাতেও তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে প্রচুর। ভারতীয় লেখক হিসেবে সে দেশে কৃষণ চন্দর খুবই জনপ্রিয়। ১৯৬৯ সালে তাঁকে দেওয়া হয় সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার। ১৯৫৯ সালে সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে দেওয়া হয় 'পদ্মশ্রী' উপাধি।

তাঁর রচিত প্রথম গল্পের নাম *ঝিলাম মে নাও পর* (ঝিলামে নৌকায়)। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে *সিকাস্ত, গদ্দার, মেরে ইয়াদোঁকে চিনার, গাঁধে কি সর গুজস্ত, জব খেত জাগে* উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথম ছোট সংকলন *তিলসাম-ই-খেয়াল* এবং ১৯৩৯ সালে *নজরে* গল্প প্রকাশিত হয়।

কৃষণ চন্দর *আত্মকথায়* লিখেছেন, তাঁর ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরুর অ্যালার্জি ছিল, বিশেষত *গাধার আত্মকথা* বইটি লিখবার পর সেটা আরও বেড়ে যায়। এই বইয়ে পণ্ডিতজির সঙ্গে গাধার দেখা হওয়ার ব্যঙ্গাত্মক সংলাপ ছিল। মস্কো যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট পাচ্ছিলেন না দীর্ঘদিন, তাই রেগেমেগে এই বইটি মাত্র ১১ দিনে লিখেছিলেন তিনি। বইটি পণ্ডিতজির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই সময় দিল্লির রুশ দূতাবাসে অক্টোবর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত নেহরু হাজির ছিলেন। ফটোগ্রাফাররা পণ্ডিতজিকে ঘিরে ছবি তুলছিলেন। কৃষণ চন্দরের লেখিকা স্ত্রী সালমা সিদ্দিকীর ভীষণ ইচ্ছে নেহরুজির সঙ্গে আলাপ করার। কিন্তু কৃষণজি না গিয়ে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীকে অনুরোধ জানালেন সালমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে। অরুণা আসফ আলী দুজনকে হাত ধরে পণ্ডিতজির কাছে নিয়ে গেলেন আর পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি কৃষণ চন্দর, ইনি তাঁর স্ত্রী সালমা সিদ্দিকী।' পণ্ডিতজি সালমাকে দেখে জড়িয়ে ধরতেই চারদিকে ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশের ঝলকানি; কিন্তু কৃষণ চন্দরের দিকে ফিরেও তাকালেন না। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'পণ্ডিতজি আপনি একে চেনেন না। ইনি কৃষণ চন্দর।' পেছনে তাকিয়ে কৃষণ চন্দরকে লক্ষ করে বললেন, 'হ্যাঁ জানি, গাধাওয়ালা।' তারপর মুখ ঘুরিয়ে পণ্ডিতজি অন্য অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। তখন কৃষণ চন্দর বুঝতে পারলেন, পণ্ডিতজি *গাধার আত্মকথা* বইটি পড়েছেন। তারপর তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, এ ঘটনা থেকে মেলে তার প্রমাণ। এটাই ছিল পণ্ডিতজির সঙ্গে কৃষণ চন্দরের শেষ দেখা।

মানবতা যেখানে ভূলুণ্ঠিত সেখানে তিনি আপসহীন লেখনী চালিয়েছেন। সাদত হাসান মান্টো উর্দু ছোটগল্পকে আঁটসাট কাঠামোতে ঢালাই করে তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, আর কৃষণ চন্দর একে মানবিক গুণাবলিতে উদ্ভাসিত করেছেন। তিনি ছিলেন একজন উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। অসাম্প্রদায়িক এই লেখককে ধর্মীয়

গোঁড়ামি কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। সব ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সামাজিক কুসংস্কারের উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। সাথি ছিলেন দুনিয়ার সব নিপীড়িত মানুষের। বিশ্বের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার।

১৯৫৯ সালে তাঁর হৃদরোগ দেখা দেয়। দুবার হার্ট অ্যাটাকের পর পেসমেকার বসানো হয়। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি বলেছিলেন, 'তাঁর মৃত্যুর পর যেন পেসমেকারটি কোনো গরিব রোগীর দেহে বসানো হয়।' এই মহান উর্দু কথাশিল্পী অবশেষে ১৯৭৭ সালের ৮ মার্চ বোম্বাইয়ের একটি ক্লিনিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। কৃষণ চন্দর বেঁচে থাকবেন উর্দু সাহিত্যে রূপকথার জাদুকর হিসেবে, একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে।

কৃষণ চন্দরের উল্লেখযোগ্য গল্প ও উপন্যাস

গল্প সংকলন : ১. *তিলসাম-ই-খেয়াল*, ২. *জিন্দেগি কে মোড় পর*, ৩. *নয়ে আফসানে*, ৪. *নগমে কি মওত*, ৫. *হাম ওয়াহসি হ্যায়*, ৬. *টুটে হুয়ে তারে*, ৭. *তিন গুন্ডে*, ৮. *এক গির্জা এক খন্দক*, ৯. *সমুন্দার দূর হ্যায়*, ১০. *নয়ে আফসানে*, ১১. *ইউক্যালিপটাস কি ডালি*, ১২. *দিল কিসিকা দোস্ত নেহি*, ১৩. *কৃষণ চন্দর কে আফসানে*, ১৪. *মিস নৈনিতাল*, ১৫. *সপ্নোঁকা কয়েদি*, ১৬. *দাসোঁয়া পুল*, ১৭. *মীনাবাজার*, ১৮. *গুলশান গুলশান ঢুঁয়া তুমকো*, ১৯. *আধে ঘন্টেকা খুদা*, ২০. *উলঝি লডকি কালে বালে*।

উপন্যাস : ১. *শিকস্ত*, ২. *জব ক্ষেত জাগে*, ৩. *তুফান কি কলিয়া*, ৪. *দিলকি ওয়াদিয়াঁ সো গঁয়ি*, ৫. *আসমান রওশন হ্যায়*, ৬. *এক গধেহ কি সর গুজস্ত*, ৭. *গদ্দার*, ৮. *গধে কি ওয়াপসি*, ৯. *বরফকে ফুল*, ১০. *সড়ক ওয়াপেস যাতি হ্যায়*, ১১. *মেরি ইয়াদোঁকে চিনার*, ১২. *চাঁদি কে ঘাও*, ১৩. *এক গধা নেফা মে*, ১৪. *মিট্টিকে সনম*, ১৫. *এক ভাওলিন সমুন্দরকে কিনারে*, ১৬. *লন্ডনকে সাত রং*, ১৭. *পাঁচ লোফার*, ১৮. *পাঁচ লোফার এক হিরোইন*, ১৯. *গোয়ালিয়র কা হজাম*, ২০. *বোম্বাই কি শাম*, ২১. *চন্দা কি চাঁদনি*, ২২. *কার্নিভাল*, ২৩. *চম্বল কি চামেলি*, ২৪. সপনোঁ কি ওয়াদি, ২৫. *উসকা বদন মেরা চমন*, ২৬. *সোনে কা সনসার* এবং ২৭. *আধা রাস্তা*।

শিশুসাহিত্য : ১. *উল্টা দরখ্ত*, ২. *লালতাজ*, ৩. *খরখোশ কা সপনা*, ৪. *সোনে কী সন্দুকচি*, ৫. *বেকুউফোঁ কি কাহানিয়াঁ*, ৬. *হামারা ঘর*, ৭. *বাহাদুর গিয়ে জং*, ৮. *শয়তান কা তোহফা খেলোনা*, ৯. *চিড়িয়োঁ কি আলিফ লায়লা*।

নাটক : ১. *সরাএ কে বাহর*, ২. *শিকস্ত কে বাদ*, ৩. *ঝাড়ু*, ৪. *ইশক কে বাদ*, ৫. *নকশ্ ফরিয়াদি*, ৬. *দরওয়াজা*, ৭. *মাঙ্গলিক*, ৮. হজামৎ, ৯. *নীলকণ্ঠ*, ১০. *বেকারি*, ১১. *কাহরা কি এক শাম* এবং ১২. *সরায়ে কে বাহর*।

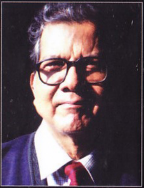

আলোকচিত্র : নাসির আলী মামুন

জাফর আলম

জন্ম : ১৯৪৩ সালে কক্সবাজারে। স্কুলজীবন থেকেই লেখালেখি শুরু। ষাটের দশকে অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। তথ্য অধিদপ্তর থেকে সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে অবসর নেন ২০০১ সালে।

অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত। মুন্সি প্রেমচন্দ, মুলকরাজ আনন্দ, হেরমান হেসে-সহ নানা খ্যাতিমান লেখকের লেখা অনুবাদ করেছেন। উর্দু ও হিন্দি সাহিত্য অনুবাদে তাঁর দক্ষতা অনন্য।

বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রচ্ছদ শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

ভারত বিভাগের সময় দাঙ্গায়
ক্ষতবিক্ষত হয় ভারত ও পাকিস্তান।
প্রাণ হারায় লাখ লাখ
অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশু।
ধর্ষিত হয় অসংখ্য নারী। উদ্বাস্তু হয়
পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও বাংলার লাখ লাখ মানুষ।
সেই ভয়াবহ দাঙ্গার বিরুদ্ধে
যাঁরা কলম ধরেছিলেন উর্দুভাষী লেখক
কৃষণ চন্দর তাঁদের অন্যতম।
পেশোয়ার এক্সপ্রেস-এর গল্পগুলো
যেন তারই এক জীবন্ত দলিল।

Prothoma
201308000068
পেশোয়ার এক্সপ্রেস
125.00

ISBN 978 984 8765 41 8
9 789848 765418